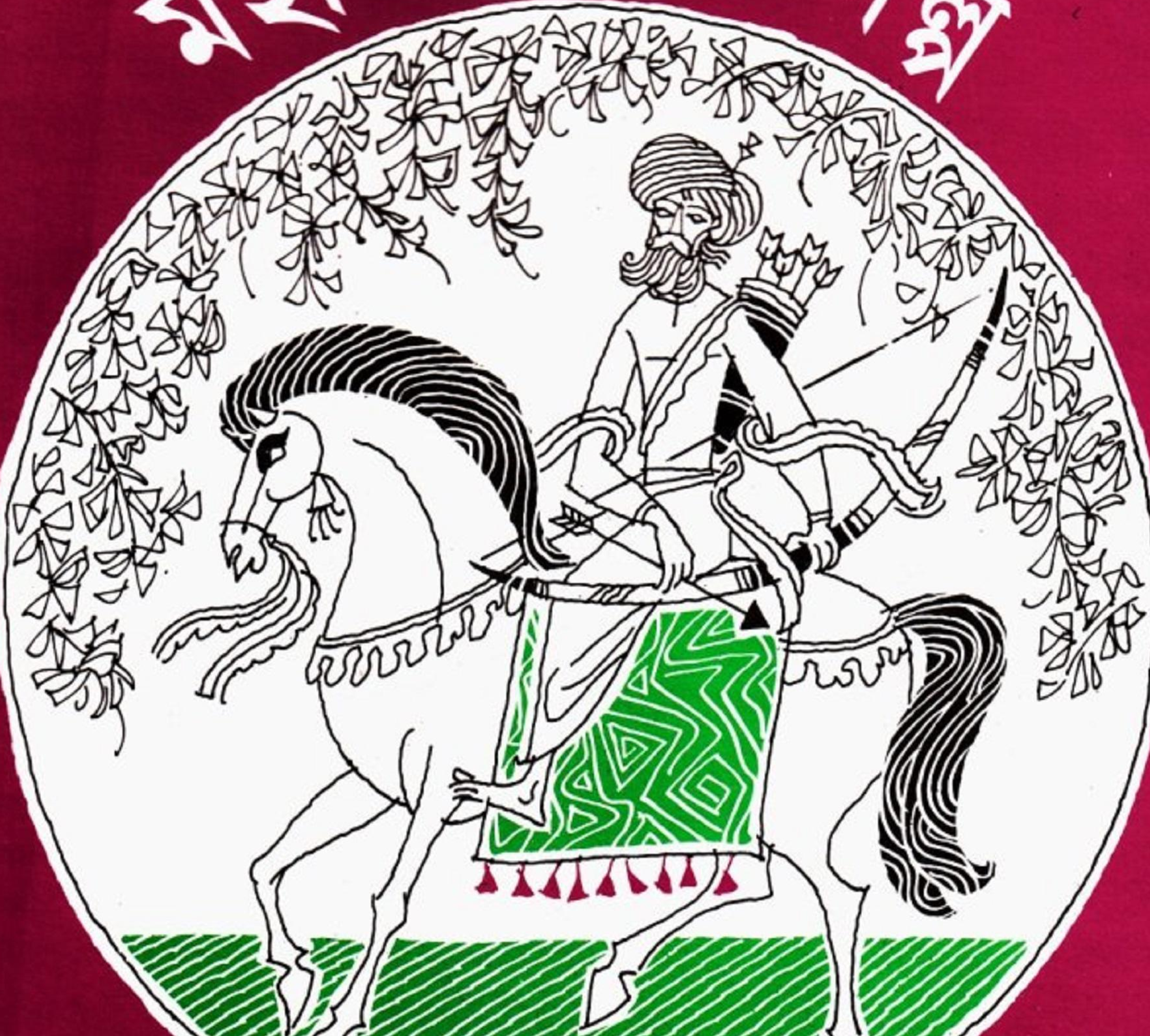
লীলা মজুমদার

মহাভারতের গল্প



শিশু সাহিত্য সংসদ

ভূমিকা

লোকে বলে মহাভারত লিখেছিলেন ব্যাসদেব। তার মানে নয় এ বই তাঁর মনগড়া গল্প দিয়ে ভরা। এত বড় বই কোনও একজন মানুষের পক্ষে বানিয়ে লেখা সম্ভব নয়।

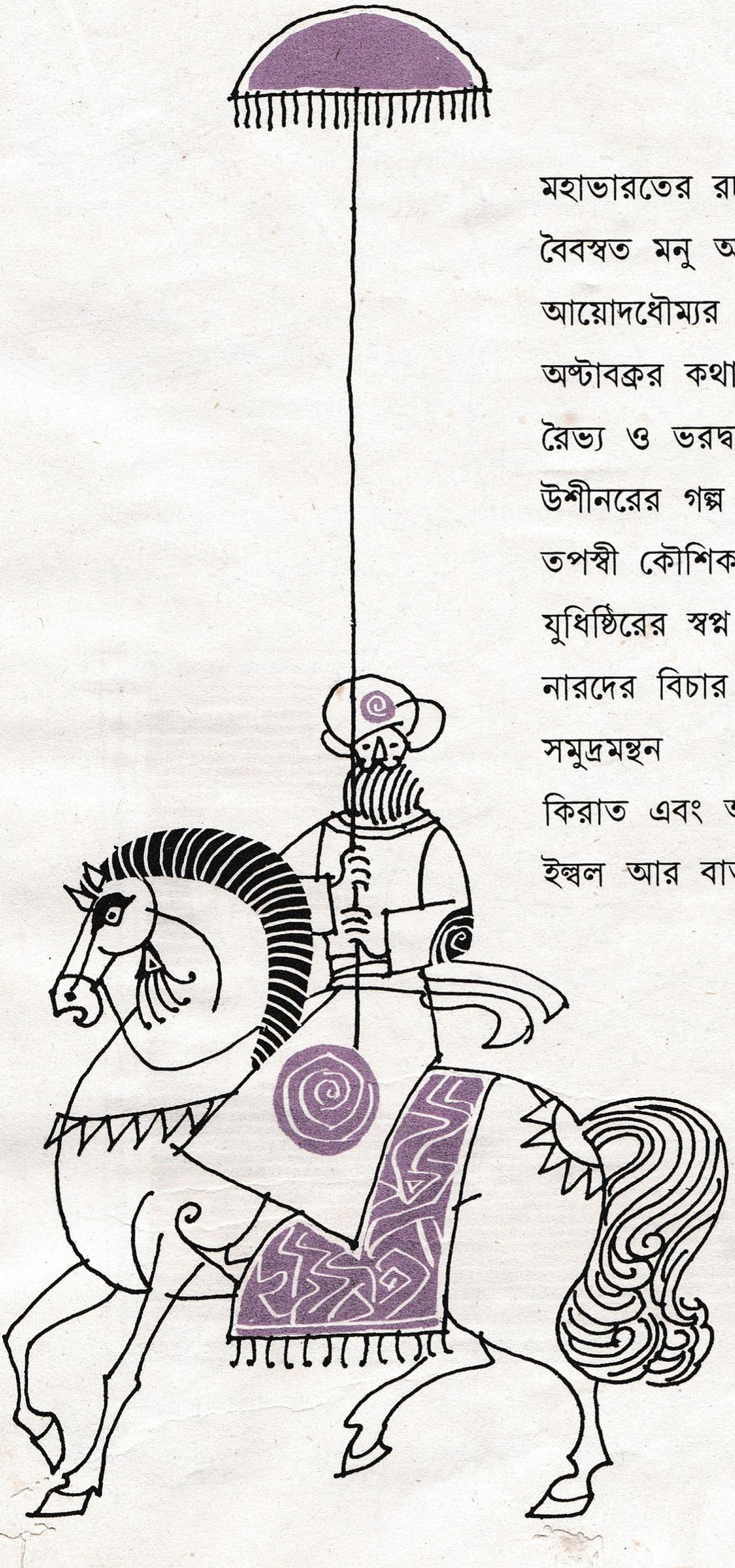
সেকালে আর্যদের মধ্যে যত প্রবাদ, রূপকথা, উপকথা, ইতিহাস, বিশ্বাস, ধর্ম নিয়ে আলোচনা, রাজ্যশাসন, নিয়মকানুন, মায় গোটা রামায়ণের গল্পও এর মধ্যে লেখা আছে। এত বড় বই আজ পর্যন্ত কোনও দেশে, কোনও ভাষায় লেখা হয়েছে বলে জানা যায়নি।

আমাদের এই ছোট বইখানিতে সেই বিশাল মহাভারত থেকে খানকতক ছোট গল্প বাছাই করে ছোটদের উপহার দেওয়া হয়েছে। এসব হল চিরকালের সত্য দিয়ে গড়া গল্প, যা কখনও সেকেলেও হয় না, অকেজোও হয় না।

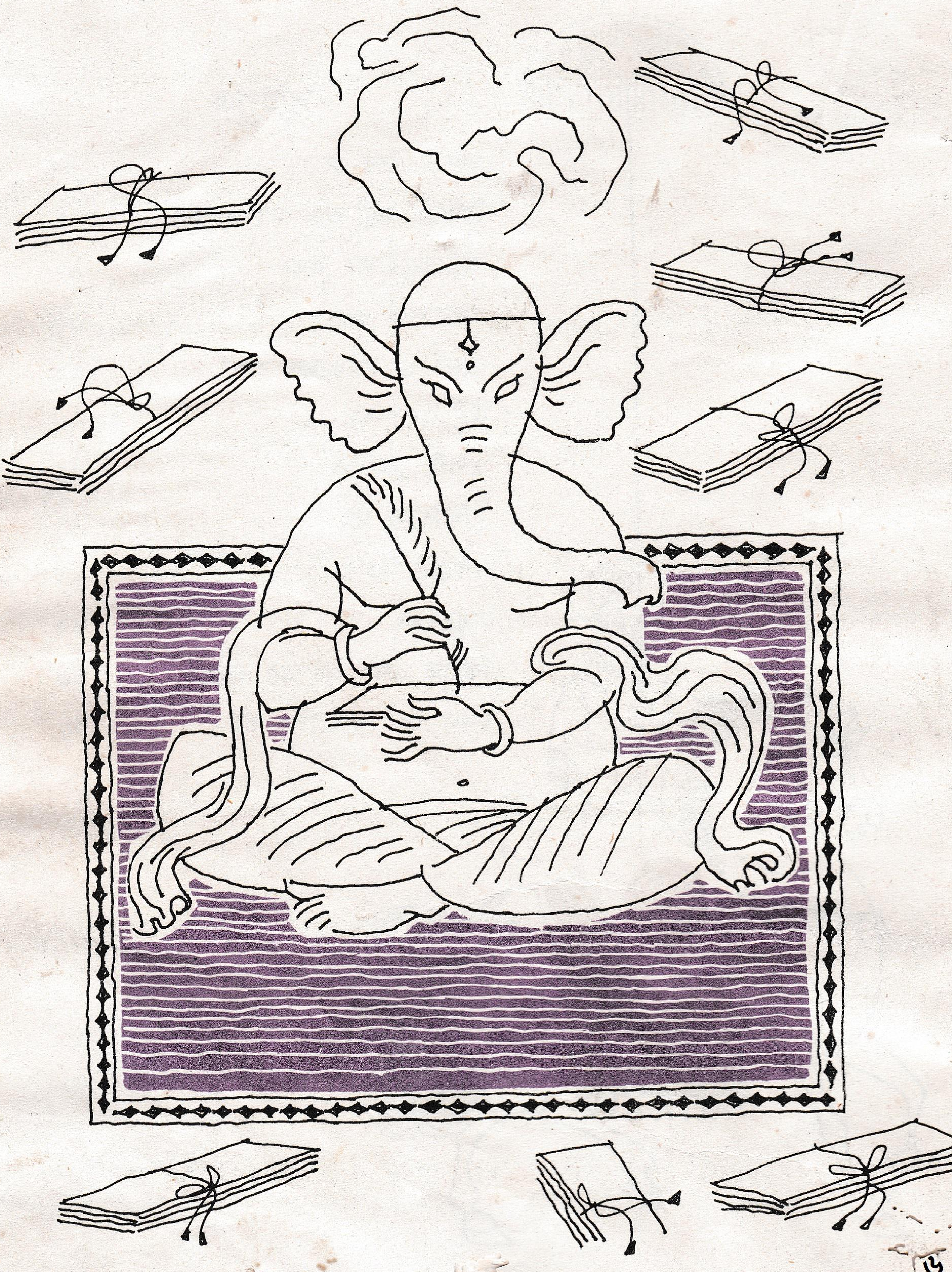
এগুলি পড়ে তোমরা যতখানি শিক্ষা পাবে, ঠিক ততখানি আনন্দও পাবে, মনে মনে এই আশা নিয়ে এ বই ছোটদের হাতে দেওয়া হল।

লীলা মজুমদার





সূচিপত্র



মহাভারতের রচনা

পণ্ডিতদের মতে মহাভারতের গল্প কোনও একজন লোকের রচনাও নয়, সমস্তটা একবারে লেখাও হয়নি। ব্যাসদেব সম্ভবত নানা গুণীজনের কাছে কিছু কিছু শুনেছিলেন আর তার সঙ্গে নিজের ভাবনা দিয়ে গড়া অনেক নতুন আর গভীর তত্ত্বকথা মিশিয়ে মহাভারত রচনা করেছিলেন।

সে এক বিরাট ব্যাপার। শোনা যায় দেবতারা একবার তাঁদের দাঁড়িপাল্লার এক দিকে চার বেদ উপনিষদ আর অন্য দিকে ব্যাসদেবের মহাভারত রেখে ওজন করে দেখেছিলেন, পরেরটাই বেশি ভারী। অবশ্য ওজন দিয়ে গুণের মাপ হয় না।

সে যাই হোক, ওই বিশাল মহাভারত মনে মনে রচনা করে ব্যাসদেব বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এই বিশাল রচনাকে শ্লোকের আকারে লিখে না রাখলে, শিষ্যদের শেখাবেন কী করে ? তিনি নিজে না হয় তৈরি করে দিলেন, কিন্তু ওই এক লক্ষ শ্লোক লিখে রাখাও তো সহজ কাজ নয়। এমন লেখক কোথায় পাবেন ?

এই সময় স্বয়ং ব্রহ্মা দেখা দিয়ে বললেন, 'তুমি গণেশকে খুশি করে, তাঁকে দিয়ে এ কাজ করিয়ে নিতে পারবে।'

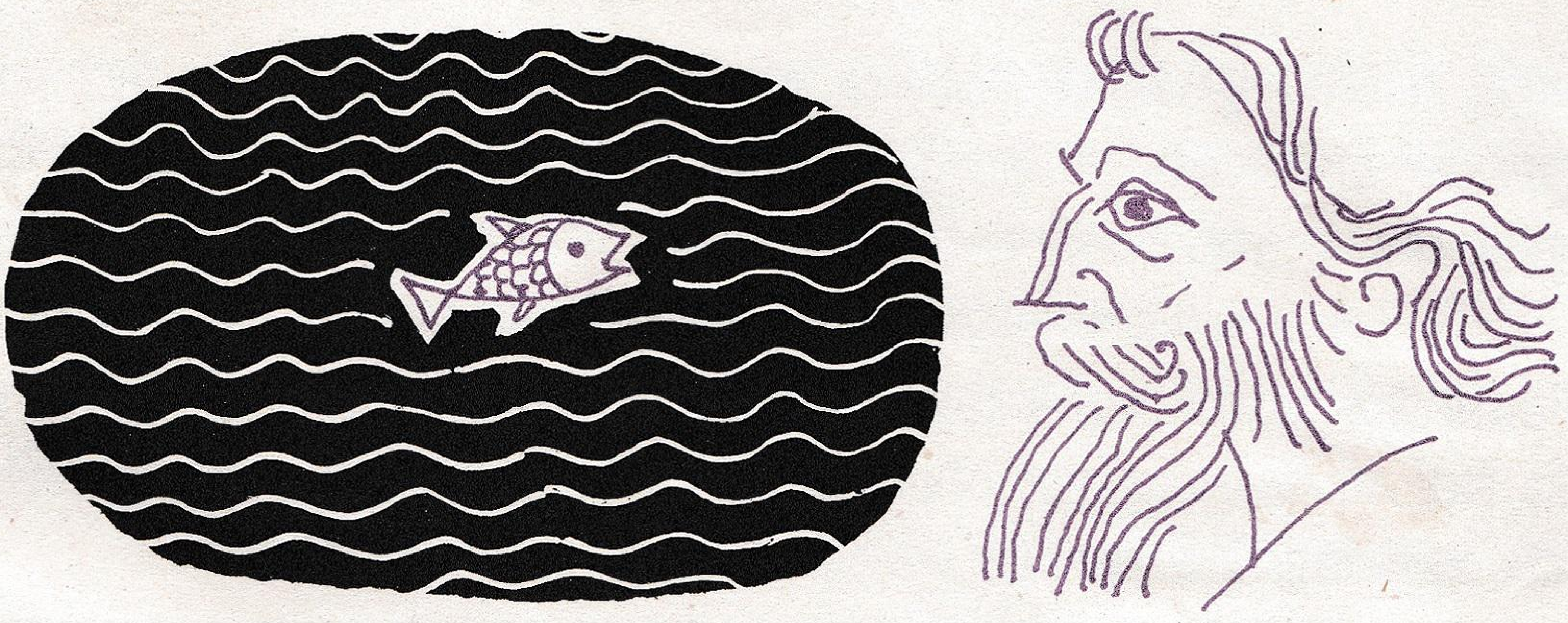
ব্যাসদেব তখন গণেশের কাছে গিয়ে তাঁর প্রার্থনা জানালেন। গণেশ বললেন, 'আপনার রচনা আমি নিশ্চয় লিখে দেব। কিন্তু এক শর্তে। আমার কলম ক্রমাগত কাজ করে চলবে। তাকে আপনি এক দণ্ডও অপেক্ষা করাতে পারবেন না।'

ব্যাসদেব সেই শর্তেই রাজি হয়ে গেলেন।

তিনি মনে মনে এই রকম ভাবলেন, পৃথিবীতে মাত্র এক লক্ষ শ্লোকের প্রচার হবে। বাকি সব দেবলোক, গন্ধর্বলোক, স্বর্গ ইত্যাদি নানা স্থানের জন্য। ওই এক লক্ষ শ্লোকের মধ্যেও অনেকগুলিরই মানে বড়ই শক্ত। সেগুলি লিখতে গণেশঠাকুরকে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে। ততক্ষণে ব্যাসদেবও মনে মনে আরও বহু শ্লোক রচনা করে ফেলতে পারবেন। কাজেই তিনি নিশ্চিন্ত ভাবে গণেশের কথায় সম্মত হয়েছিলেন।

এই ভাবেই মহাভারত লেখা হয়েছিল। লেখা হলে পর ব্যাসদেব প্রথমেই তার শিষ্যদের পাঠ দিলেন। তারও পরে, রাজা জনমেজয় আর ব্রাহ্মণরা ব্যাসদেবকে অনেক অনুনয় বিনয় করেছিলেন, ওই পাঠ শুনবার জন্য। শেষ পর্যন্ত ব্যাসদেব তাঁর প্রধান শিষ্য বৈশম্পায়নকে ডেকে রাজাকে ও ব্রাহ্মণদের ওই মহাকাব্য শোনাবার অনুমতি দিয়েছিলেন।





বৈবস্বত মনু আর মাছের গল্প

সূর্যের এক নাম বিবস্বান। তাঁর ছেলে মনুকে তাই বলা হয় বৈবস্বত মনু। রাজ্য পাবার পর বদরিকাশ্রমে গিয়ে তিনি দশ হাজার বছর তপস্যা করেছিলেন বলে শোনা যায়। সেকালের রাজা মহাপুরুষদের সম্মান দেখাবার জন্য, তাঁদের দশ বছরকে দশ হাজার বছর, দশ ছেলেকে দশ হাজার ছেলে বলা হত।

সে যাই হোক, একদিন তিনি চীরিনী নদীর ধারে যেতেই ছোট একটা মাছ তীরের কাছে এসে কাতর স্বরে বলল, 'আমাকে বাঁচান, নইলে বড় মাছরা আমাকে মেরে ফেলবে।'

তাই শুনে মনুর বড় দয়া হল। তিনি খুদে মাছটিকে তুলে নিয়ে একটা জালার মধ্যে রাখলেন। দেখতে দেখতে সে এত বড় হয়ে গেল যে জালায় আর আঁটে না। মনু তাকে বের করে নিয়ে মস্ত বড় একটা পুকুরে ছেড়ে দিলেন।

কয়েক দিনের মধ্যেই পুকুরেও তাকে ধরে না। অনেক ভেবেচিন্তে মনু তাকে গঙ্গায় ছেড়ে দিলেন। সেখানেই শেষ নয়। কিছু দিন পরে মনু গঙ্গার ধারে গেছেন। মাছের তখন বিরাট আকার। সে এসে বলল, 'প্রভু, কী করব, গঙ্গায় তো আমাকে আঁটছে না, আমাকে বরং মহাসাগরে ছেড়ে দিন।'

অনেক কষ্টে মনু তাই করলেন। তখন মাছ হেসে বলল, 'ভগবান, আপনি আমার জন্য যথেষ্ট করেছেন। এবার আমিও আপনার কিছু উপকার করতে ইচ্ছা করি। মন দিয়ে শুনুন।'

'পৃথিবী পাপে পূর্ণ হয়েছে। প্রলয়কাল আসন্ন। সমস্ত চরাচর জলে ডুবে যাবে। আপনি শক্ত কাঠের একটি প্রকাণ্ড নৌকো তৈরি করুন। তাতে ধাতুর বদলে শক্ত দড়ি

ব্যবহার করবেন। খুব মজবুত করে কাজ করবেন। তারপর সপ্তর্ষিদের সঙ্গে নিয়ে এবং পুরাকালের ব্রাহ্মণেরা যে সব বীজের কথা লিখে গেছেন, সে সমস্ত নিয়ে নৌকোয় উঠে আমার জন্য অপেক্ষা করবেন।

সেই সময় আমার মাথায় একটা শিঙ গজাবে। সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গেলে, আপনারা নৌকোয় উঠে আমাকে মনে করবেন। আমিও তখনই উপস্থিত হব আর আপনি শক্ত দড়ি দিয়ে আমার শিঙের সঙ্গে নৌকো বাঁধবেন। তারপর মহাপ্লাবন আরম্ভ হবে, কিন্তু আমি আপনাদের রক্ষা করব।'

মাছের কথামতো মনু সব কাজ সমাধা করলেন। যথাসময়ে মাছকে মনে করা মাত্র সে মাথায় এক মহা শিঙ নিয়ে জল কেটে উপস্থিত হল। মনু শক্ত দড়ি দিয়ে সেই বিশাল শিঙের সঙ্গে নৌকো বাঁধলেন। মাছ নৌকো নিয়ে তুমুল জলরাশির মধ্যে দিয়ে মহা বেগে ছুটল।

দেখতে দেখতে চারদিক ঝেঁপে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। ঝড় উঠল। মহাসাগর তোলপাড় করে বিশ্ব চরাচর ডুবিয়ে দিল। একটি প্রাণীও বাঁচল না। কেবল মাছের শিঙে বাঁধা মনুর নৌকোখানি সেই মহাপ্লাবনের জলের উপর ভেসে রইল।



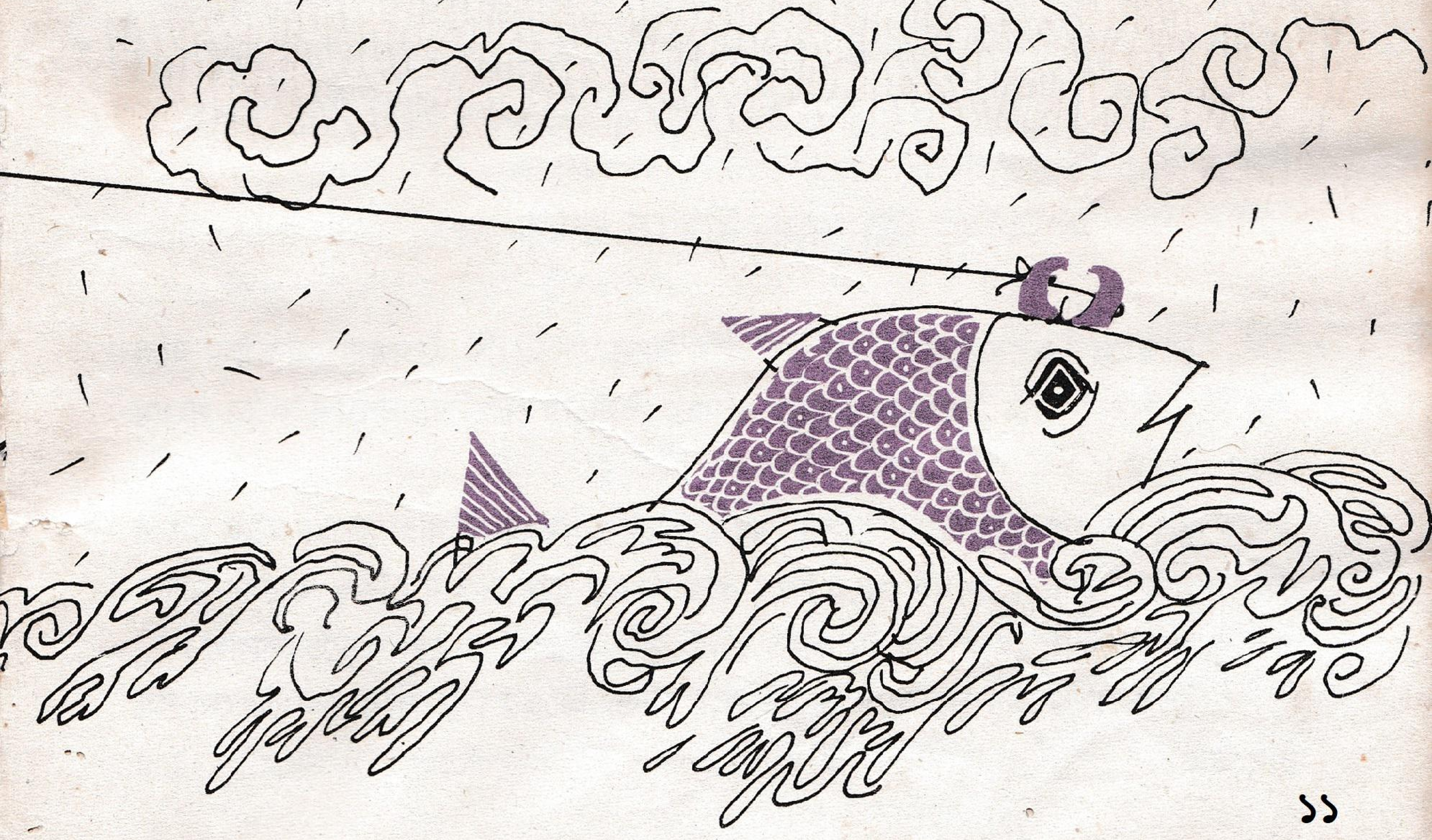
এই ভাবে অনেক কাল কেটে গেল। জল একটু নামলে, হিমালয়ের কাছে এসে পর্বতের এক উঁচু চুড়োকে জলের উপর উঠে থাকতে দেখে, মাছের কথায়, তার সঙ্গে দড়ি দিয়ে মনু নৌকো বাঁধলেন। সেই চুড়োকে আজও লোকে বলে নৌবন্ধন।

এবার মাছ ঋষিদের আর মনুকে বলল, 'আমিই প্রজাপতি ব্রহ্মা। মাছের রূপ নিয়ে তোমাদের সকলকে রক্ষা করেছি। তোমরা নতুন করে পৃথিবীতে জীব-জন্তু, মানুষ, গাছপালা-ফল-শস্য উৎপাদন করো।'

এই বলে ব্রহ্মা অন্তর্হিত হলেন। আর মনু এবং ঋষিরা তাঁর আজ্ঞা পালনে ব্রতী হলেন। তার আগে কঠোর তপস্যা করে মনু সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

এ কাহিনী যেমন আমরা মার্কণ্ডেয় পুরাণে পাচ্ছি তেমনই বাইবেলে সাধু নোহর গল্পেও প্রায় একই ঘটনার অন্য রূপ দেখি। সেখানে জল নামলে মধ্য এশিয়ার অ্যারারাট পর্বতে নৌকো লেগেছিল। নৌকোয় পৃথিবীর সব জীব-জন্তু ও পাখির এক জোড়া আর যাবতীয় ফল-শস্যের বীজ দেবদূতের আদেশে রক্ষিত ছিল। আর নোহর সপরিবারে ছিলেন।

জল কমলে, নৌকো থেকে নেমে তাঁদের প্রথম কাজ হল ভগবানের উপাসনা করা। মাছের কথা এ গল্পে নেই।





আয়োদধৌম্যর কথা

সেকালে আয়োদধৌম্য বলে এক ঋষি ছিলেন। আরুণি, উপমন্যু আর বেদ বলে তাঁর তিন শিষ্য ছিলেন। তখনকার গুরুরা তাঁদের শিষ্যদের শাস্ত্রবিদ্যা ছাড়াও কঠিন সংযম শিক্ষা দিতেন।

একদিন গুরু আরুণিকে বললেন, 'বৎস, আজ তোমাকে আমার খেতের আল বাঁধার কাজ দিলাম।' আরুণি তখনই খেতে গিয়ে কাজ আরম্ভ করে দিলেন। কিন্তু আলের মাটির এক জায়গায় বালি আর কাদা থাকাতে সেইখানটি বারবার ভেঙে পড়তে লাগল।

শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে আরুণি শুয়ে পড়ে, নিজের পিঠ দিয়ে জল চুঁয়ানো বন্ধ রাখলেন।

এদিকে তাঁর দেরি দেখে চিন্তিত হয়ে, অন্য দুই শিষ্যকে নিয়ে গুরু নিজেই খেতের ধারে পৌঁছে ব্যাপার দেখে আশ্চর্য হলেন।

তাঁর ডাকে উঠে এসে আরুণি বললেন, 'গুরুদেব, কিছুতেই জল বন্ধ করতে না পেরে, ওই ফাটলে শুয়ে পড়েছিলাম। বলুন কী করতে হবে ?'

আয়োদধৌম্য খুশি হয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'বৎস, তোমার বাধ্যতার জন্য তুমি শ্রেষ্ঠ হবে। সমস্ত বেদ আর ধর্মশাস্ত্র তোমার মনে প্রকাশ পাবে।'

এর পর উপমন্যুকে গুরু বললেন, 'বৎস, তুমি আমার গোরু-বাছুর চরাতে বনভূমিতে যাবে।'

মস্ত বড় গোরুর পাল ; যাতে এদিক ওদিক না পালায়, হিংস্র জানোয়ার না ধরে, অখাদ্য কিছু না খায়, পগারে না পড়ে, বা অন্য ভাবে জখম না হয়, তাই ভোর থেকে সন্ধ্যা অমনি তাদের আগলে রাখতে হয়। সন্ধ্যার আগে ক্লান্ত শরীরে গোরুর পালকে নিরাপদে গোয়ালে তুলে, তবে তাঁর কাজ শেষ হয়।

এইভাবে দিন কাটে। একদিন গুরু বললেন, 'বাছা, তোমাকে তো বেশ হৃষ্টপুষ্ট দেখছি, তুমি কী খাও ?'

উপমন্যু বললেন, 'আমি ওরই মধ্যে ভিক্ষা করে খাই।' গুরু বললেন, 'আমাকে নিবেদন না করে সেটা তোমার উচিত হয় না।' তখন থেকে শিষ্য ভিক্ষার ঝুলিসুদ্ধ সবই গুরুকে এনে দিতেন। তবু তাঁর স্বাস্থ্য দেখে গুরু বললেন, 'এখন কী খাও ? উপমন্যু বললেন, 'আরেকবার ঝুলি নিয়ে গোটা দুই বাড়ি থেকে দু মুঠো সংগ্রহ করি।'

গুরু বললেন, ' তা হলে তুমি অন্য ভিক্ষাজীবীদের ভাগে ভাগ বসাও। লোভী হয়ে পড়ছ। অমন কাজ কোরো না। আরও কিছুদিন পরে গুরু বললেন, 'তবু তো তোমার ভালো স্বাস্থ্যই দেখছি। এখন কী খাও ?'

উপমন্যু বললেন, 'বাছুরদের সঙ্গে একটু করে দুধ খাই।' সে কী কথা ! ওদের ভাগ কম পড়ে তাহলে। আর খেয়ো না।' আরও কদিন পরে প্রশ্ন করে গুরু শুনলেন উপমন্যুর শরীর তবু ভালো আছে, কারণ বাছুরদের দুধ খাওয়া হয়ে গেলে তাদের মুখ দিয়ে যে ফেনা গড়ায় শিষ্য তাই চেটে খান। গুরু বললেন, 'ওতে ওদের পুষ্টি কম হয়। আর খেয়ো না।'

তখন নিরুপায় হয়ে উপমন্যু ঘাস পাতা বুনো ফল খেয়ে দিন কাটাতে লাগলেন। একদিন আকন্দ পাতা খাবার সময় চোখে তার রস লেগে গেল। উপমন্যুর দুই চোখ অন্ধ হয়ে গেল। কপালে আরও দুঃখ ছিল। হাতড়ে হাতড়ে এগোচ্ছেন। পথের মাঝখানে ছিল



একটা ন্যাড়া কুয়ো। দেখতে না পেয়ে উপমন্যু তার মধ্যে পড়ে গেলেন। অনেক ডাকাডাকি করলেন, কিন্তু ওই ঘন বনে জনমানুষের চলাফেরা ছিল না। সন্ধ্যাবেলা গোরুগুলোকে ফিরতে দেখে গুরুর বড় ভাবনা হল। ভাবলেন তাহলে উপমন্যুর নিশ্চয় কোনও বিপদ হয়েছে। অমনি তিনি অন্য দুই শিষ্য নিয়ে বনে গিয়ে নাম ধরে ডাকাডাকি করতে লাগলেন। কুয়োর মধ্যে থেকে উপমন্যু উত্তর দিলেন, 'গুরুদেব আকন্দপাতা খেয়ে আমি অন্ধ হয়ে কুয়োর মধ্যে পড়ে গেছি।'

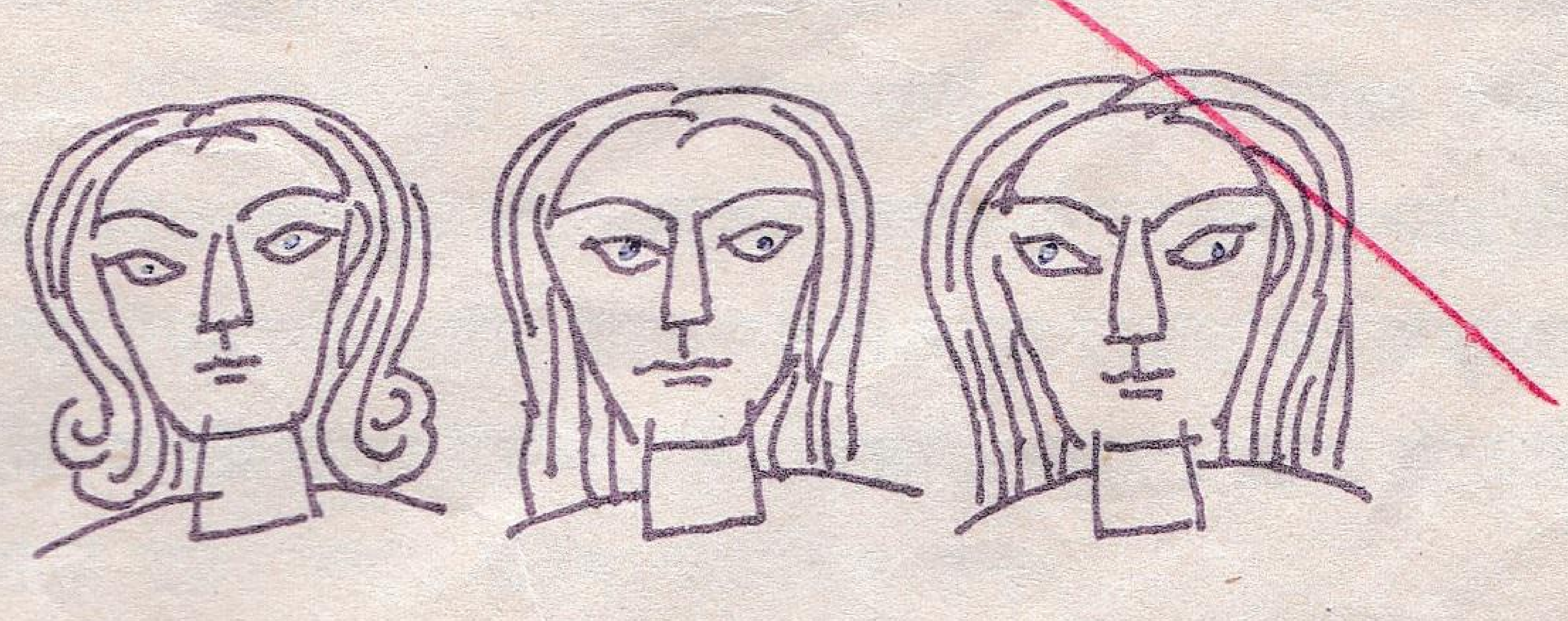
ধৌম্য বললেন, 'অশ্বিনীকুমাররা দেবতাদের বৈদ্য। তাঁদের স্তব করো। তাঁরা তোমার চোখ সারিয়ে দেবেন।' তাই করলেন উপমন্যু। অশ্বিনীকুমাররা খুশি হয়ে, পিঠে হাতে নিয়ে দেখা দিয়ে বললেন, 'এই পিঠে খেলে দৃষ্টি ফিরে পাবে।'

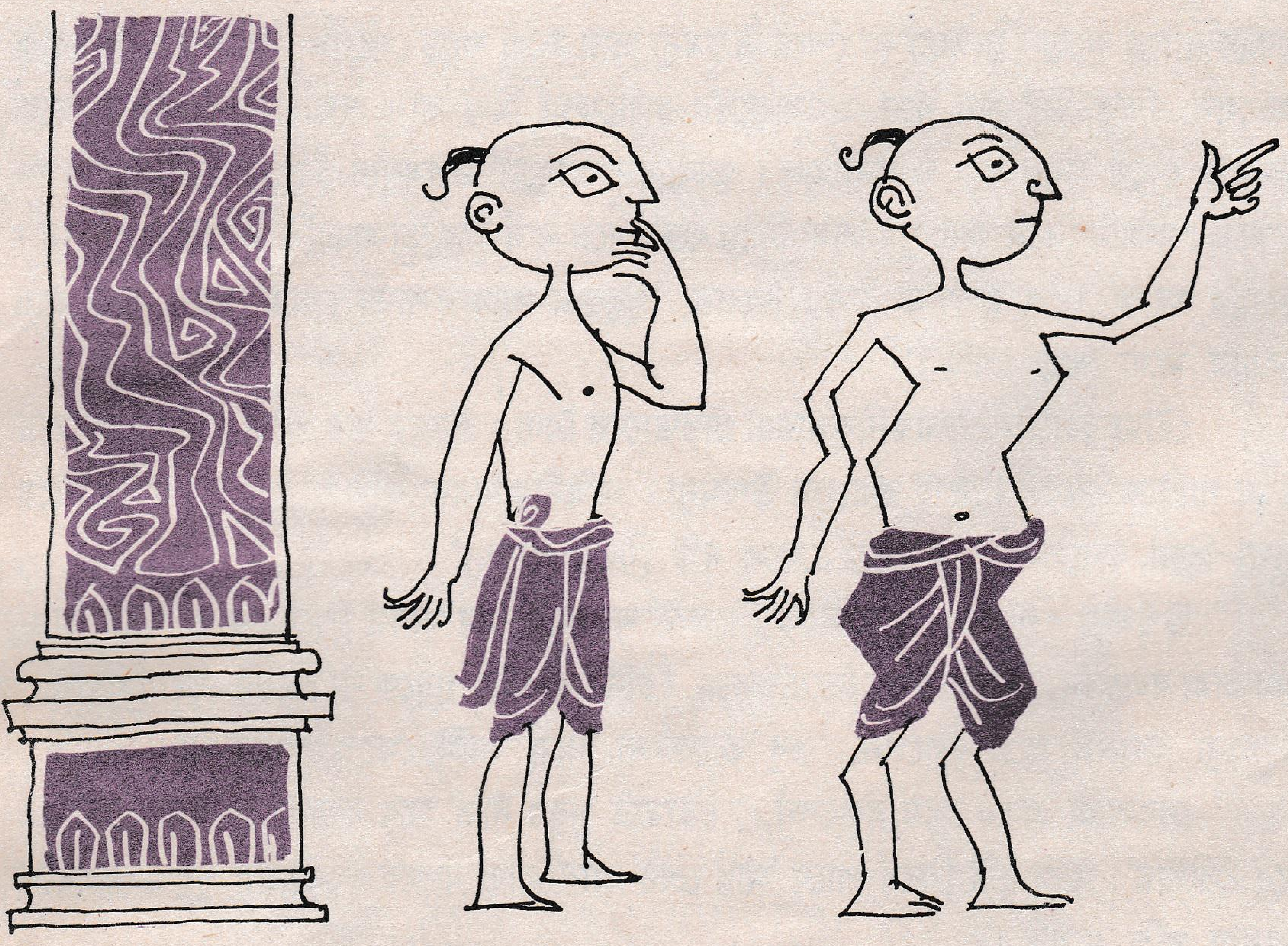
উপমন্যু বললেন, 'গুরুদেবকে নিবেদন না করে তো আমি পিঠে খেতে পারি না।' দেবতারা বললেন, 'তাঁকে যখন দিয়েছিলাম, তিনি তো তাঁর গুরুকে না দিয়েই খেয়েছিলেন।' উপমন্যু অনুনয় করে বললেন, 'তবু তাঁকে না দিয়ে আমি খেতে পারব না।'

দেবতারা প্রসন্ন হয়ে বললেন, ' তোমার গুরুর দাঁত হবে কালো লোহার, তোমার হবে সোনার। তুমি দৃষ্টি ফিরে পাবে আর শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ করবে। তোমার গুরুভক্তি দেখে আমরা খুশি হয়েছি।'

গুরুও শিষ্যকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'তোমার পরীক্ষা শেষ হয়েছে। তুমি বেদ ও সব ধর্মজ্ঞান লাভ করবে।'

এর পর তৃতীয় শিষ্যকে বললেন, 'বৎস বেদ, তুমি আমার বাড়িতে কিছু কাল থেকে, আমায় সেবা করলে তোমার ভালো হবে।' বেদ তখনই গুরুগৃহে চলে গেলেন। সেখানে অষ্টপ্রহর বলদের মতো খাটতে লাগলেন। তার উপর খাওয়াদাওয়ার কষ্টও সইতে হত। শেষ পর্যন্ত তাঁর ধৈর্য আর কর্তব্যজ্ঞান দেখে খুশি হয়ে ধৌম্য তাঁকে সর্ব জ্ঞানের অধিকারী করে দিলেন। এইভাবে আয়োদধৌম্যর তিন শিষ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।



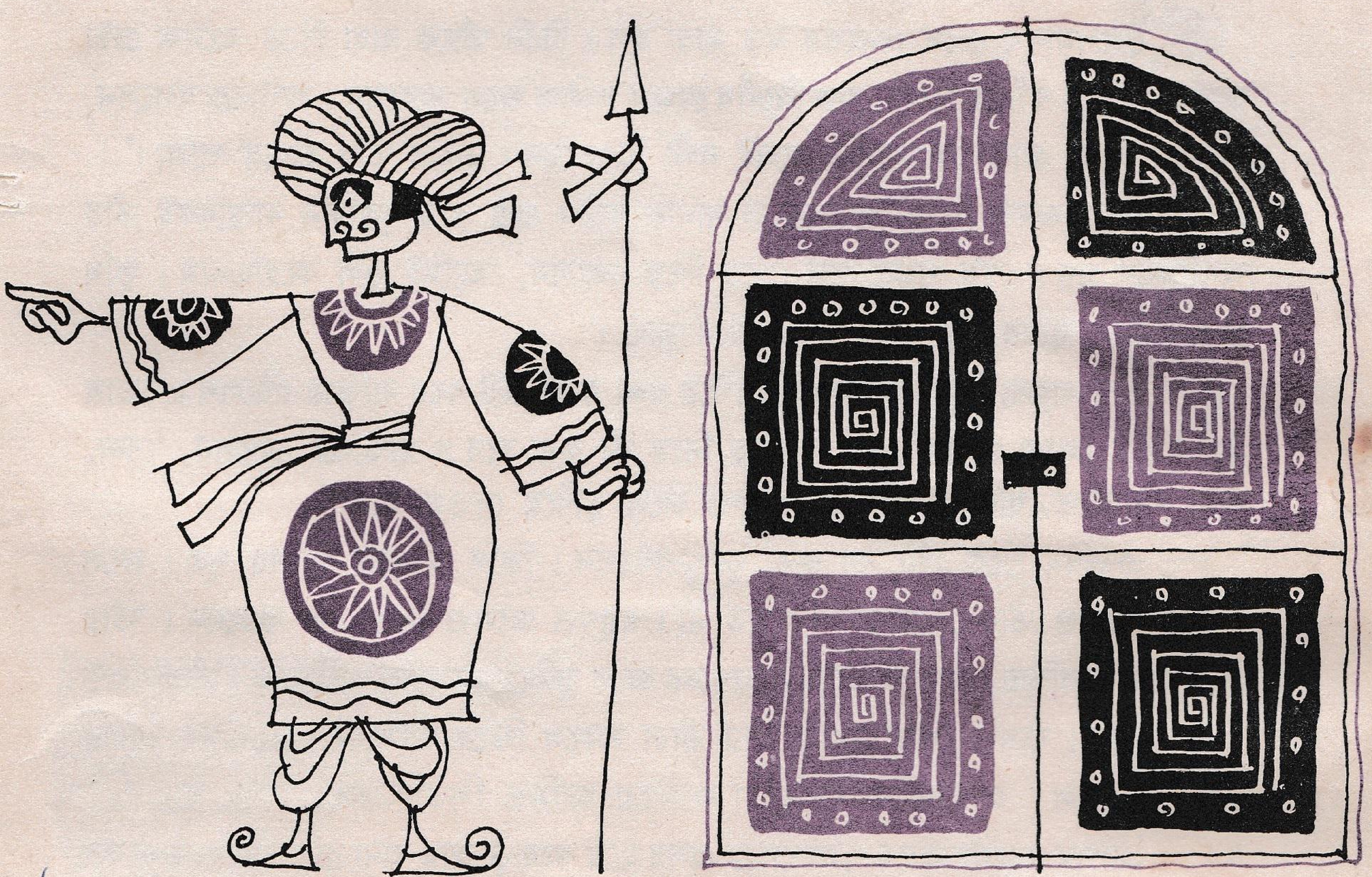


অষ্টাবক্রর কথা

সেকালে উদ্দালক নামে এক বেদজ্ঞ ঋষি ছিলেন। তিনি তাঁর শিষ্য কহোড়ের সঙ্গে নিজের মেয়ে সুজাতার বিয়ে দিয়েছিলেন। সুজাতার ছেলে মায়ের পেটে থাকতেই, শুনে শুনে গভীর শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করেছিলেন। এমন কী একদিন বাপের বেদ পড়া শুনে আর থাকতে না পেরে, তাঁর ভুল ধরে দিয়েছিলেন। তখনও তিনি জন্মাননি।

কহোড় অপদস্ত হয়ে, রেগে গিয়ে ছেলেকে শাপ দিয়েছিলেন, 'এই রকম বেয়াদবির জন্য তোর শরীর আট জায়গায় বাঁকা হবে।'

সে যাই হোক, সেকালের ঋষিরা সকলে বড়ই দরিদ্র হতেন। ছেলে জন্মাবার কিছু দিন আগে কহোড় জনক রাজার কাছে কিছু সাহায্য চাইতে গেলেন। সেখানে মহা তর্কবিৎ বন্দীর কাছে বিতর্কে হেরে গেলেন। ফলে বন্দীর নিয়ম মতো তাঁকে জলে ডুবিয়ে দেওয়া হল।



উদ্দালক তখন নিজের ছেলে শ্বেতকেতুর সঙ্গে, সুজাতার ছেলে অষ্টাবক্রকে মানুষ করতে লাগলেন। বাপের কথা তাঁকে জানতে দেওয়া হয়নি। তিনি উদ্দালককেই বাপ বলে মনে করতেন, শ্বেতকেতুকে ভাবতেন ভাই। একটু বড় হলে সুজাতা তাঁকে সব কথা বললেন।

তখন অষ্টাবক্র শ্বেতকেতুকে নিয়ে জনক রাজার যজ্ঞ দেখতে চললেন। সেখানে পৌঁছলে তর্কসভার প্রবেশপথে দ্বারপাল তাঁদের বাধা দিলেন। 'এটা ছেলে-ছোকরার জায়গা নয়। বন্দীর সঙ্গে তর্ক করে বুড়ো বুড়ো ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরাও হেরে যাচ্ছেন আর বন্দীর যেমন নিয়ম, তাঁদের সবাইকে জলে ডুবিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তোমরা ছেলেমানুষ, ভালোয় ভালোয় সরে পড়ো। এখানে শুধু জ্ঞানীগুণী বুড়ো ব্রাহ্মণদেরই জায়গা আছে। অষ্টাবক্র বললেন, 'বয়স কম হতে পারে, তবু আমরা জ্ঞানীগুণী, ব্রতচারী ব্রাহ্মণ। কাজেই বৃদ্ধও বলতে পারেন।' তাঁকে কতকগুলি কূট প্রশ্ন করে সঠিক উত্তর পেয়ে দ্বারপাল স্তম্ভিত হলেন।

তখন অষ্টাবক্র জনককে বললেন, 'শুনেছি বন্দীর সঙ্গে তর্কে যাঁরা হেরে যান, তাঁদের জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। আমি তাঁকে পরাজিত করব।'

ছেলেমানুষ দেখে জনকের বড় মায়া হল। তিনি তাঁকে বাধা দিতে অনেক চেষ্টা করলেন। মনে করিয়ে দিলেন কত নির্দোষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জলে ডুবেছেন। অষ্টাবক্র বললেন, 'আমার মতো প্রতিপক্ষ পাননি বলেই বন্দী জিতেছেন। এবার তাঁর হারার পালা।'

রাজা জনক নিজে অষ্টাবক্রকে নানান কঠিন প্রশ্ন করে বুঝলেন বাস্তবিকই তাঁর অসাধারণ গুণ। শেষ পর্যন্ত পথ ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'আমিই ভুল করেছিলাম। তুমি বালক নও, স্থবির। এবার বন্দীর সামনে যাও।'

বলা বাহুল্য সেই বিতর্কে হেরে গিয়ে বন্দী মাথা হেঁট করে দাড়িয়ে রইলেন। সভায় মহা হইচই লেগে গেল। এবার বন্দীকে নিয়ে কী করা হবে ? অষ্টাবক্র বললেন, 'কেন, অন্য পরাজিত পণ্ডিতদের মতো এঁকেও জলে ডুবিয়ে দেওয়া হবে।'

এতদিন পরে বন্দী সব কথা খুলে বললেন। তিনি আসলে বরুণের পুত্র। জলে ডুবিয়ে দিলেও তাঁর কোনও ক্ষতি হত না। বরুণও জলেও নিচে যজ্ঞ করছেন। 'তাঁর সেই যজ্ঞে উপস্থিত থাকতেই আমি ব্রাহ্মণদের জলে ডুবিয়ে সেখানে পাঠিয়েছি। তাঁরা কেউ মারা যাননি। যজ্ঞও শেষ হয়েছে আর তাঁরা সকলে ফিরে আসছেন। আমারও এবার ছুটি হয়ে গেল। অষ্টাবক্রকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমিও পিতার কাছে ফিরে যাব।'

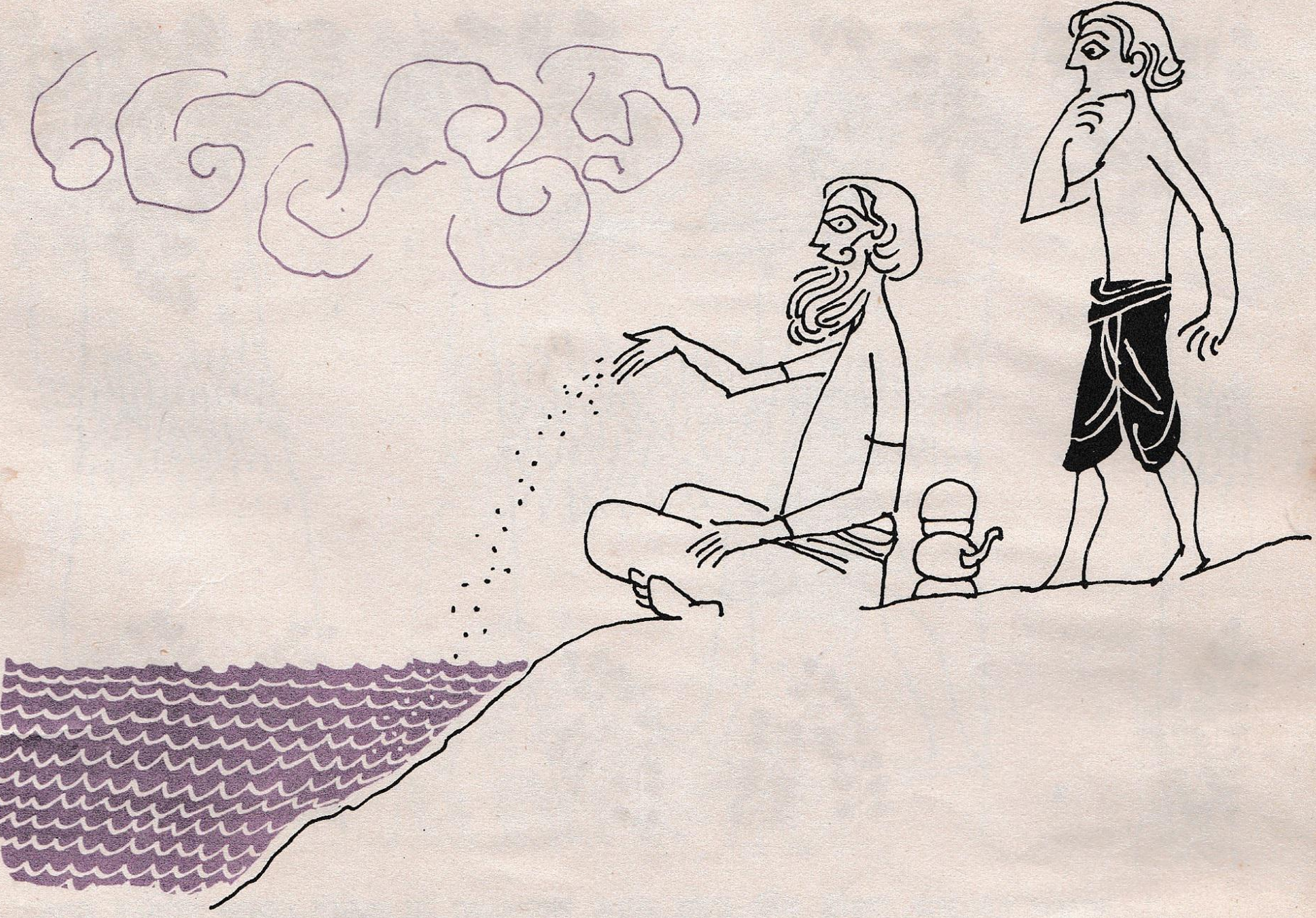
এরপর বরুণের কাছে পূজা পেয়ে প্রসন্ন হয়ে কহোড় আর অন্য ব্রাহ্মণেরাও জনকের সভায় ফিরে এলেন। কহোড় বললেন, 'মহারাজ, আমি যা পারিনি, আমার ছেলে তাই করে সকলকে উদ্ধার করেছে। সে ধন্য !'

জনকের কাছে বিদায় নিয়ে বন্দী সমুদ্রে প্রবেশ করলেন আর সকলে স্বস্থানে ফিরে গেলেন। কহোড় উদ্দালকের আশ্রমে ফিরে, অষ্টাবক্রকে বললেন, 'বৎস, তুমি এবার আমাদের এই নদীতে একটা ডুব দিয়ে ওঠো।'

অষ্টাবক্র ডুব দিয়ে যখন উঠলেন, সকলে আশ্চর্য হয়ে দেখল তাঁর বাঁকা দেহ সোজা ও সুন্দর হয়ে উঠেছে। অঙ্গ সব সমান হয়ে গেছে।

সেই থেকে ওই নদীর নাম হল সমঙ্গা।





রৈভ্য ও ভরদ্বাজের গল্প

সেকালে ভরদ্বাজ আর তাঁর বন্ধু রৈভ্য পাশাপাশি আশ্রমে থাকতেন। রৈভ্যের দুই ছেলে অর্বাবসু আর পরাবসু। তিনজনেই মহা বিদ্বান। ভরদ্বাজের অত পাণ্ডিত্য ছিল না, কিন্তু তিনি ছিলেন ভক্তিভাজন তপস্বী। তাঁর একমাত্র ছেলের নাম যবক্রীত।

যবক্রীত কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন, যাতে গুরুর কাছে পড়াশুনো না করেই বেদজ্ঞ হতে পারেন। ইন্দ্র তাঁকে অনেক বারণ করলেন। বললেন, এর ফল ভালো হবে না। যবক্রীত তাঁর কথায় কান দিলেন না।

অগত্যা ইন্দ্র এক রুগ্ন বুড়ো ব্রাহ্মণ সেজে, যবক্রীতের সামনেই গঙ্গার ধারে এসে মুঠো মুঠো বালি তুলে জলে ফেলতে লাগলেন। এই ব্যাপার চোখে পড়তেই ব্যস্ত হয়ে যবক্রীত বললেন, 'হে ব্রাহ্মণ, এ আপনি মিছিমিছি কী করছেন ? বুড়ো বললেন, 'কেন ? লোকে গঙ্গা পারাপার করবে বলে সেতু বানিয়ে দিচ্ছি।'

যবক্রীত বললেন, 'তপোধন, শুধু বালি দিয়ে কি সেতু হয় ? সে তো অসম্ভব কাজ।'



ব্রাহ্মণ বললেন, 'তুমি যদি গুরুর কাছে পড়াশুনো না করেই বেদজ্ঞ পণ্ডিত হতে পার, তা হলে তাই বা হবে না কেন?'

এতক্ষণে তাঁকে চিনতে পেরে, হাত জোড় করে যবক্রীত বললেন, 'দেবরাজ, আমার তপস্যাকে যদি আপনি নিষ্ফল মনে করেন, তা হলে আমাকে এই বর দিন যেন আমি বেদজ্ঞ হই।'

তখনই ইন্দ্র বর দিলেন, 'তোমরা পিতাপুত্র দুজনেই বেদজ্ঞ পণ্ডিত হবে।'

বাপের কাছে সব কথা বললে, ভরদ্বাজ বললেন, 'এখন থেকে সাবধানে থেকো বৎস। এত সহজে বেদজ্ঞান লাভ করে, তোমার মনে যেন অহংকার না জন্মায়, তা হলে মন ছোট হয়ে যাবে আর সর্বনাশ ডেকে আনবে। রৈভ্য রাগী মানুষ। তাঁর বিরক্তির কারণ হয়ো না।'

যবক্রীত বললেন, 'নিশ্চিন্ত থাকুন পিতা। আমি তাঁকে বাপের মতো মান্য করি।'

দুঃখের বিষয়, ভরদ্বাজ যা ভয় করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত ঠিক তাই হল। রৈভ্যের আশ্রমে গিয়ে অত্যন্ত অসৎ আচরণের ফলে, রৈভ্যেরই প্রভাবে এক মায়া রাক্ষসের হাতে যবক্রীত প্রাণ দিলেন।



সেই নিদারুণ সংবাদে, শোকে আকুল হয়ে তাঁর একমাত্র ছেলের চিতায় ভরদ্বাজ নিজের প্রাণ বিসর্জন দিলেন। মৃত্যুর আগে তিনি বলে গিয়েছিলেন যে রৈভ্য যেমন তাঁকে পুত্রহারা করলেন, তেমনি রৈভ্যও নিজের ছেলের হাতে মারা যাবেন।

হয়েছিলও তাই। একবার শেষ রাতে বনের মধ্যে দিয়ে আশ্রমে ফেরার পথে, হরিণের চামড়া পরা বাপকে সেই আধো-অন্ধকারে হরিণ মনে করে, পরাবসু তাঁকে বধ করেছিলেন।

এর পর পরাবসুর দোষে আর নানা ভুল বোঝাবুঝির ফলে, অর্বাবসু বনে গিয়ে সূর্য দেবের আরাধনা করতে লাগলেন।

প্রসন্ন হয়ে সূর্যদেব আর অন্যান্য দেবতারা দেখা দিয়ে, তাঁকে বর দিতে চাইলেন। তাঁর প্রার্থনায় যবক্রীত, ভরদ্বাজ, রৈভ্য প্রাণ ফিরে পেলেন আর পরাবসুর অপরাধের ক্ষমা হল।

পরে যবক্রীত দেবতাদের জিজ্ঞাসা করলেন, রৈভ্যের কাছে তিনি কেন পরাভূত হয়েছিলেন। দেবতারা বললেন 'তুমি শুধু তপস্যার জোরে বেদজ্ঞ হয়েছ আর রৈভ্য দীর্ঘকাল গুরুসেবা আর অধ্যয়ন করে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হয়েছেন।'

উশীনরের গল্প

পাণ্ডবরা বনবাসে নানা জায়গায় ঘুরে, শেষে যমুনার পাশে জলা আর উপজলা এই দুই নদীর ধারে পৌঁছলেন। সঙ্গে ছিলেন লোমশ মুনি, তিনি এই স্থান সম্বন্ধে চমৎকার এক গল্প বললেন।

লোমশ বলেছিলেন এই জায়গায় রাজা উশীনর যজ্ঞ করেছিলেন। রাজা সেই সুন্দর জায়গায় বিশ্রাম করছেন, হেনকালে ভয়ে ঝটপট করতে করতে একটা পায়রা উড়ে এসে তাঁর কোলে লুকাল।

সঙ্গে সঙ্গে এক হিংস্র বাজপাখিও ছোঁ মেরে তাকে ধরতে না পেরে, রাজাকে বলল, 'ওই পায়রাটা আমাদের ন্যায্য খাদ্য। আমার খিদে পেয়েছে, ওকে ছেড়ে দিন। ধর্মের লোভে ওকে আশ্রয় দেবেন না।'

উশীনর বললেন, 'লোভ নয়। শরণাগতকে আমি সর্বদা রক্ষা করি। তোমার কাছে ছেড়ে দিলে তার প্রাণ যাবে। তা কী করে হয়?'

বাজপাখি বলল, 'খেতে না পেলে আমারও প্রাণ যাবে। তাহলে আমার পরিবারও না খেতে পেয়ে মারা যাবে। একটা পায়রার প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে, আপনি অনেকগুলো প্রাণী বিনাশ করতে চাইছেন। এই কি আপনার ধর্ম হল?'

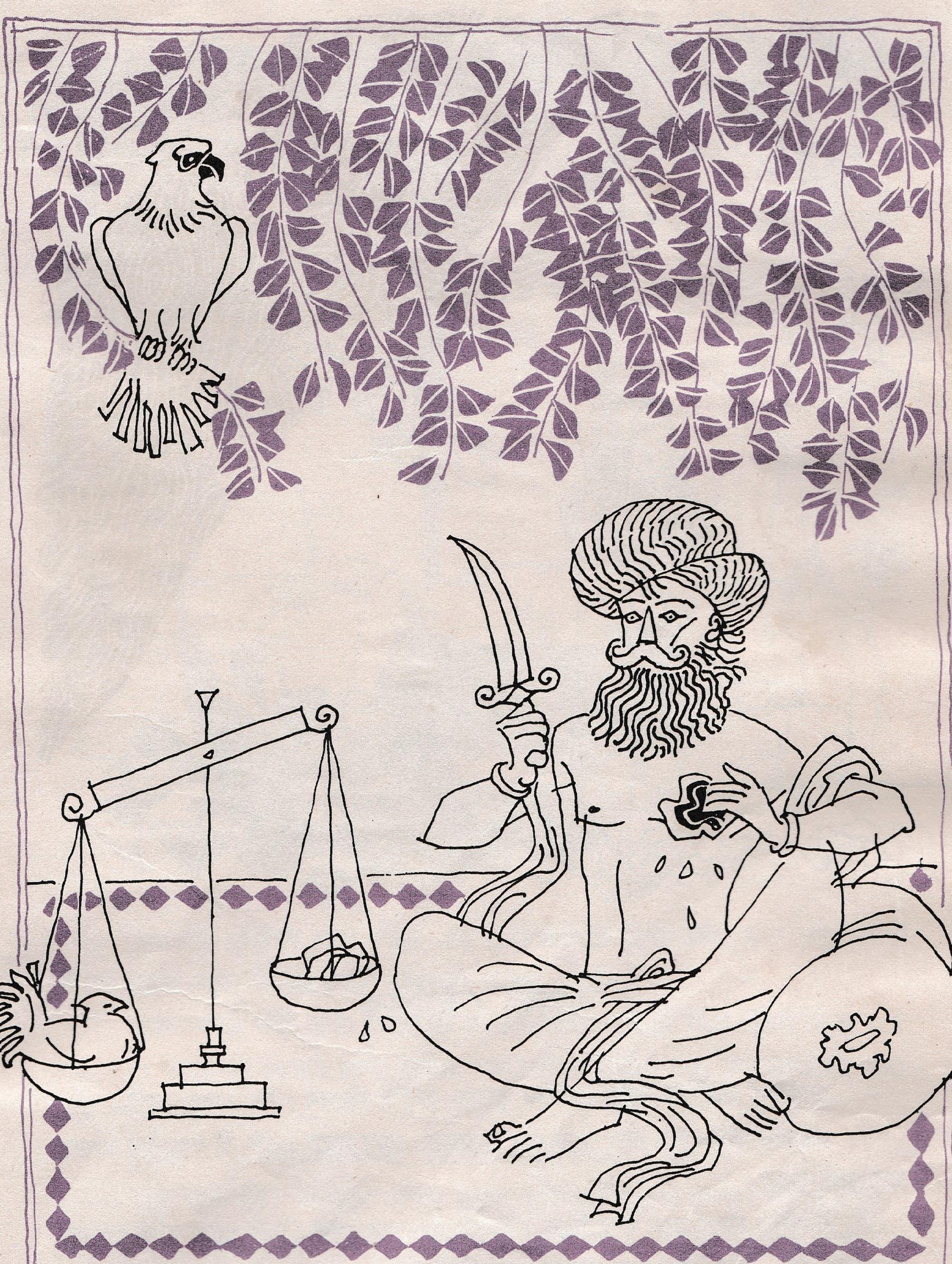
রাজা বললেন, 'তার বদলে আমার ধনসম্পদ, মায় রাজ্যসুদ্ধ যা চাও, তাই দেব। পায়রাটাকে ছেড়ে দাও।'

বাজপাখি হেসে বলল, 'পায়রাটার ওপর যদি আপনার এতই সহানুভূতি থাকে, তা হলে ও সব ধনদৌলতের বদলে বরং আমাকে আপনার নিজের বুক থেকে পায়রার সমান ওজনের মাংস কেটে দিন, আমি তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে চলে যাব।'

এ কথা শুনে রাজা খুশি হয়ে বললেন, ' এ তো ভালো কথা। আমি এখনই তাই দিচ্ছি।'

এই বলে একটা দাঁড়িপাল্লা আনিয়ে, তার একদিকে পায়রাকে বসিয়ে, অন্য দিকে তলোয়ার দিয়ে নিজের বুক থেকে মাংস কেটে দেখলেন পায়রার দিকটাই ভারী হচ্ছে। আরও খানিকটা কেটেও তাই হল। বারবার খানিকটা করে মাংস দিয়েও যখন সমান হল না, তখন নিজেই দাঁড়িপাল্লাতে উঠে বসলেন।

তখন বাজপাখি নিজের রূপ ধরে বলল, 'মহারাজ আমি ইন্দ্র আর এই পায়রা হলেন অগ্নি। আমরা তোমার ধর্মবোধের গভীরতা পরীক্ষা করতে এসেছিলাম। তুমি ধন্য। পৃথিবীর লোকে তোমার নাম কখনও ভুলবে না।' এই বলে তাঁরা উশীনরকে আশীর্বাদ করে স্বস্থানে চলে গেলেন।





তপস্বী কৌশিক

সেকালে কৌশিক নামে একজন ব্রাহ্মণ তপস্বী ছিলেন। তিনি বড় রাগী।

একদিন গাছতলায় বসে তিনি বেদ পড়ছেন, এমন সময় একটা স্ত্রী বক তাঁর মাথায় মলত্যাগ করল।

কৌশিক রেগেমেগে তার দিকে চাইতেই, সে মরে গেল। তাই দেখে ব্রাহ্মণের বড় অনুতাপ হল। তাঁর মনে হল রাগের বশে তিনি অন্যায় কাজ করেছেন।



তার পর কৌশিক গ্রামে গিয়ে, এক চেনা বাড়িতে ভিক্ষা চাইলেন। বাড়ির গিন্নি তাঁকে বসতে বলে, ভিক্ষাপাত্রটি পরিষ্কার করতে গেলেন।

এমন সময় তাঁর স্বামী খেটেখুটে বাড়ি এলেন। গৃহিণী তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁকে পা ধোবার জল, আসন, খাবারদাবার দেবার পর, সেই ব্রাহ্মণের কথা মনে পড়ল।

ভিক্ষা নিয়ে কাছে আসতেই, কৌশিক রাগে ফেটে পড়লেন।

'এর মানে কী ? আমাকে বসিয়ে রেখে, তুমি স্বামীসেবায় লেগে গেলে ? জানো, আমি ব্রাহ্মণ, ইচ্ছা করলে পৃথিবী পুড়িয়ে ছাই করতে পারি। স্বামীই তোমার কাছে বড় হল ?'

তখন সেই বুদ্ধিমতী গৃহিণী বললেন, 'রাগ দমন করুন। আমি আপনাকে অবহেলা করিনি। আমি মনে করি স্বামীর সেবাই স্ত্রীর সেরা ধর্ম। রাগ হল মানুষের শত্রু। যিনি রাগ আর মোহ জয় করতে পারেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। আপনি মিথিলায় গিয়ে ধর্মব্যাধের সঙ্গে আলাপ করলে শান্তি পাবেন।'

কৌশিকের সব রাগ পড়ে গেল। তিনি গৃহিণীকে আশীর্বাদ করে, ধর্মব্যাধের খোঁজে মিথিলায় গেলেন।

ধর্মব্যাধ তখন তাঁর দোকানে বসে হরিণের আর মহিষের মাংস বিক্রি করছিলেন।

তিনি কৌশিককে সসম্মানে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। কৌশিক তাঁকে বললেন, 'তুমি যে কাজ কর, তা তোমার মতো সাধু মানুষের যোগ্য নয়।'

ধর্মব্যাধ বললেন, 'আমি ব্যাধের ঘরে জন্মেছি। আমার যা কর্তব্য, তাই করি। বুড়ো মা-বাপের সেবা করি। সত্যি কথা বলি। হিংসা করি না। যতটা পারি দান করি। দেবতা, অতিথি আর কাজের লোকদের খাইয়ে, যা বাকি থাকে, তা-ই খাই। আমি পশু মারি না। অন্যরা যা মারে, আমি তার মাংস বেচি। আমি মাংস খাই না। ওই মাংসে দেবতাদের, পূর্বপুরুষদের, গরীবদের, অতিথিদের, কাজের মানুষদের, বাড়ির পশুপাখিদের সকলেরই প্রতিপালন হয়।

'প্রাণী হত্যা না করে কে বাঁচতে পারে ? শ্রুতি শাস্ত্রে লেখা আছে গাছপালারও প্রাণ আছে। প্রতিবার মাটিতে যে পা ফেলি আমরা, তাতেই শত শত অতি ক্ষুদ্র প্রাণী মারা পড়ে। অহিংস বলে কেউ নেই জগতে।'

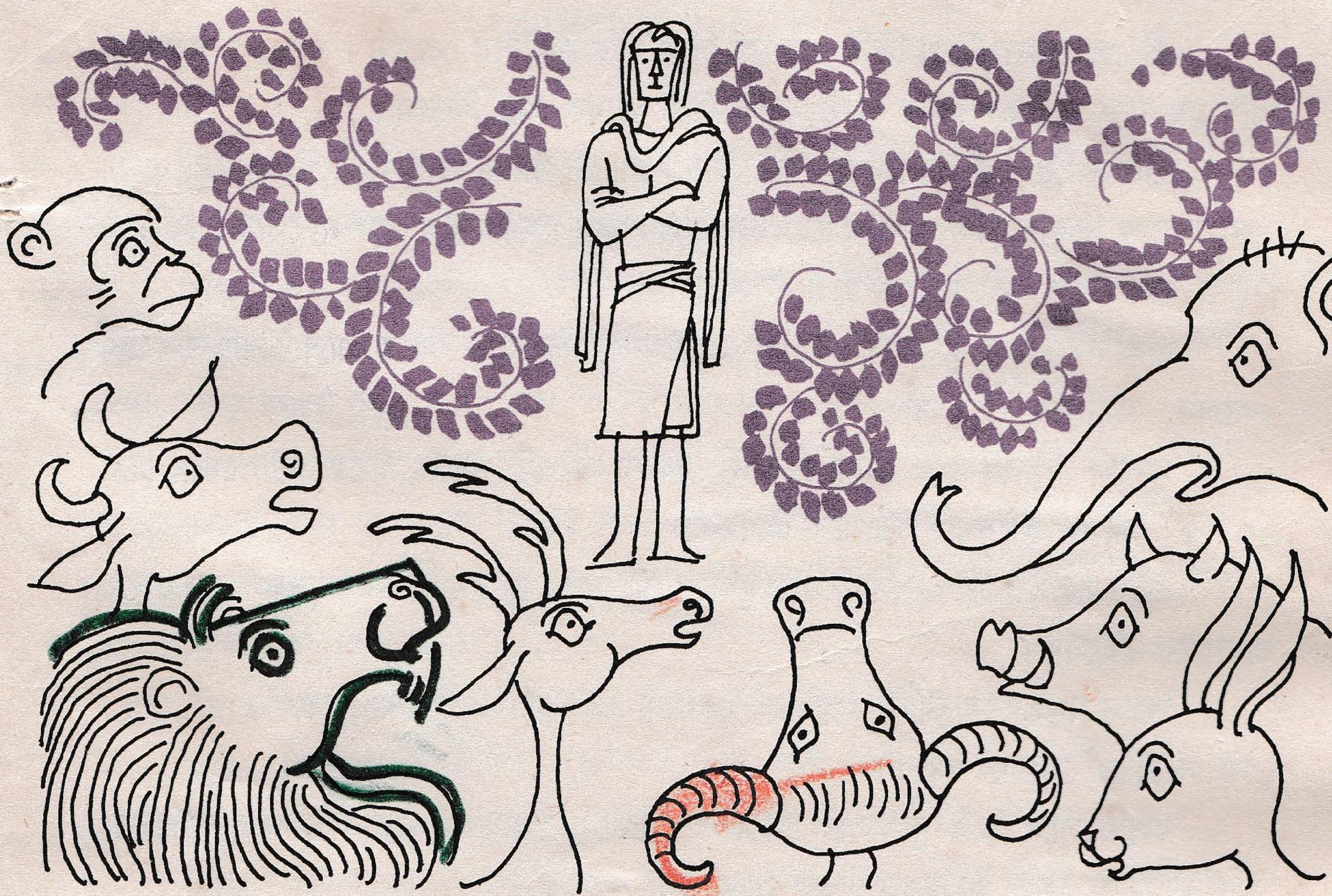
আরও অনেক কথা বলে, ধর্মব্যাধ বললেন, 'এবার দেখবেন চলুন, আমি কী উপায়ে সিদ্ধিলাভ করেছি।'

এই বলে তিনি কৌশিককে একটা সুন্দর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেখানে তাঁর মা-বাবা খাওয়াদাওয়ার পর সাদা ধবধবে কাপড় পরে, সুন্দর আসনে খুশিমনে বসে ছিলেন।

ধর্মব্যাধ বললেন, 'এঁরাই আমার পরম দেবতা। আপনি নিজের মা-বাবার অনুমতি না নিয়েই, বেদ পড়বার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। কেঁদে কেঁদে তাঁরা অন্ধ হয়ে গেছেন। এখনই গিয়ে তাঁদের সান্ত্বনা দিন।'

কৌশিক বললেন, 'আমি নরকে পতিত হচ্ছিলাম। তুমি আমাকে বাঁচালে।'

এই বলে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে, নিজের মা-বাবার কাছে ফিরে গেলেন।



যুধিষ্ঠিরের স্বপ্ন

একবার রাতে যুধিষ্ঠির স্বপ্ন দেখলেন, বনের পশুরা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে, জল ভরা চোখে, বিনীতভাবে তাঁকে বলছে—

'মহারাজ, দ্বৈতবনে আমরা মাত্র এই কটি পশু বাকি আছি। আপনার বীর ভাইরা বাকি সবাইকে মেরে শেষ করেছেন। আপনি দয়া না করলে আমরাও নির্বংশ হয়ে যাব।'

সকালে উঠে যুধিষ্ঠির ভাইদের বললেন, 'আমাদের বনবাসের এখনও এক বছর আট মাস বাকি। বেঁচে থাকার জন্য জানোয়ার মারতেই হবে। কাজেই এখানে আর নয়। আমরা আবার কাম্যকবনে ফিরে যাই।'

কাম্যকবনে ফিরে এসে, আরেক বছর কাটল। আর মাত্র আট মাস বাকি।

এই সময় এক দিন ব্যাসদেব এসে তাঁদের এই গল্পটি বললেন—

সেকালে কুরুক্ষেত্রে মুদ্গল নামে এক মুনি ছিলেন। তিনি বুনো পায়রার মতো শস্য কাটার পর খেতের মধ্যে যে দানাগুলো পড়ে থাকে, সেগুলি সযত্নে কুড়িয়ে এনে, তাই দিয়েই নিজের সংসার চালাতেন আর ব্রত পালন করতেন।

স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে তিনি পনেরো দিনে মাত্র এক বার খেতেন। প্রত্যেক অমাবস্যা পূর্ণিমায় যজ্ঞ করতেন আর অতিথিদের ব্রীহি ধানের অন্ন দিতেন।

ওই সময়ে এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটত। হয়তো ব্রীহির ভাত ফুরিয়ে এসেছে, এমন সময় আরও কিছু বাড়তি অতিথি এসে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকেই হাঁড়িতে যেটুকু ভাত ছিল, তা দশগুণ হয়ে যেত।

একদিন দুর্বাসা মুনি খালি গায়ে, রেগেমেগে, মন্দ কথা বলতে এসে উপস্থিত হয়েই বললেন, 'আমাকে ভাত দাও।'

মুদ্‌গল তখনই ভাত বেড়ে দিলেন। দুর্বাশা সমস্তটা খেয়ে, গায়ে এঁটো মেখে চলে গেলেন। মুদ্‌গল হাসিমুখে উপোস করলেন।

এইভাবে ছয়বার উপস্থিত হয়ে দুর্বাসা ওই কাণ্ড করে গেলেন। মুদ্‌গল প্রসন্নমুখে অনাহারে রইলেন।

তখন সন্তুষ্ট হয়ে দুর্বাসা বললেন, 'তোমার এই মহৎ ত্যাগের কথা স্বর্গেও পৌঁছেছে। তুমি সশরীরে সেখানে যাবে।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে মুদ্‌গলকে নিতে স্বর্গ থেকে রথ নেমে এল। দেবদূত বললেন, 'আপনি সিদ্ধি লাভ করেছেন। এই রথে স্বর্গে চলুন।'

মুদ্‌গল বিনীত ভাবে বললেন, 'আগে বলো স্বর্গবাসের দোষ আর গুণের কথা।'

দূত বলল, 'যাঁরা ধার্মিক, দোষ দুর্বলতা নেই, দান করেন, যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দেন, তাঁরাই স্বর্গে যান। সেখানে হিংসা, শোক, লোভ, মনের দুর্বলতা কিছুই নেই। দেবতারা আর অন্যান্য সাধুজন নিজের নিজের ঘরে বাস করেন।'

'স্বর্গে তেত্রিশজন ঋভু আছেন। দেবতারাও তাঁদের পুজো করেন। তাঁদের সঙ্গে আপনার ঠাঁই হয়েছে।'

'এই তো গেল স্বর্গের গুণ। এবার দোষের কথা বলি। সেখানে যে কাজ করা হয়ে গেছে, তার ফল ভোগ করে সবাই। কিন্তু নতুন কোনও কাজ করার উপায় নেই। তাছাড়া আর কেউ বেশি সুখে আছে দেখলে মন খারাপ হয়। শেষ পর্যন্ত আবার পৃথিবীতে পতন হয়।'

এ সব শুনে মুদ্‌গল বললেন, 'বাছা দেবদূত, তুমি বরং ফিরে যাও। স্বর্গসুখ আমি চাই না।'

যুধিষ্ঠিরদের এই গল্প বলে ব্যাসদেব নিজের আশ্রমে ফিরে গেলেন।

নারদের বিচার

বিশ্বামিত্রের ছেলে অষ্টক অশ্বমেধ যজ্ঞ শেষ করে প্রতর্দন, বসুমনা আর শিবি বলে তাঁর তিন ভাইয়ের সঙ্গে রথে করে ফিরছিলেন।

পথে নারদের সঙ্গে দেখা। অষ্টক নারদকে শ্রদ্ধা জানিয়ে রথে তুলে নিলেন। যেতে যেতে এক ভাই নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দেব, আমরা চার ভাই-ই স্বর্গে যাব, এ কথা জানি। কিন্তু আগে কার স্বর্গ থেকে পতন হবে এবং কেন হবে, তাই বলুন।'

নারদ বললেন, 'অষ্টকের প্রথম পতন হবে। যখন আমি তাঁর বাড়িতে ছিলাম, তখন একবার তাঁর সঙ্গে রথে যেতে নানা রঙের কয়েক হাজার গোরু দেখেছিলাম। আমি জানতে চাইলে, অষ্টক বলেছিলেন, আমি এই সব গোরু দান করেছি। এই অহংকারের জন্য তার আগে পতন হবে।'

আরেক ভাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'তার পরে কে নামবে?'

নারদ বললেন, ' প্রতর্দন। একদিন তাঁর সঙ্গে রথে যাচ্ছি, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ এসে একটা ঘোড়া চাইলেন। প্রতর্দন বললেন, ফিরে এসে দেব।

'বামুন বলল, না, এখনই দিন। প্রতর্দন রথের ডান দিকের একটি ঘোড়া খুলে দান করলেন। তারপর আরেক বামুনের প্রার্থনায় বাঁ দিকের একটি ঘোড়া দিলেন।'

'তারপর আরও দুই বামুনের কথায় বাকি ঘোড়া দুটিও খুলে দিয়ে, নিজেই রথ টানতে টানতে বললেন, এখন আর বামুনদের চাইবার কিছু রইল না। তার মানে, তাঁর মনে কিঞ্চিৎ ঈর্ষা এসেছিল।'

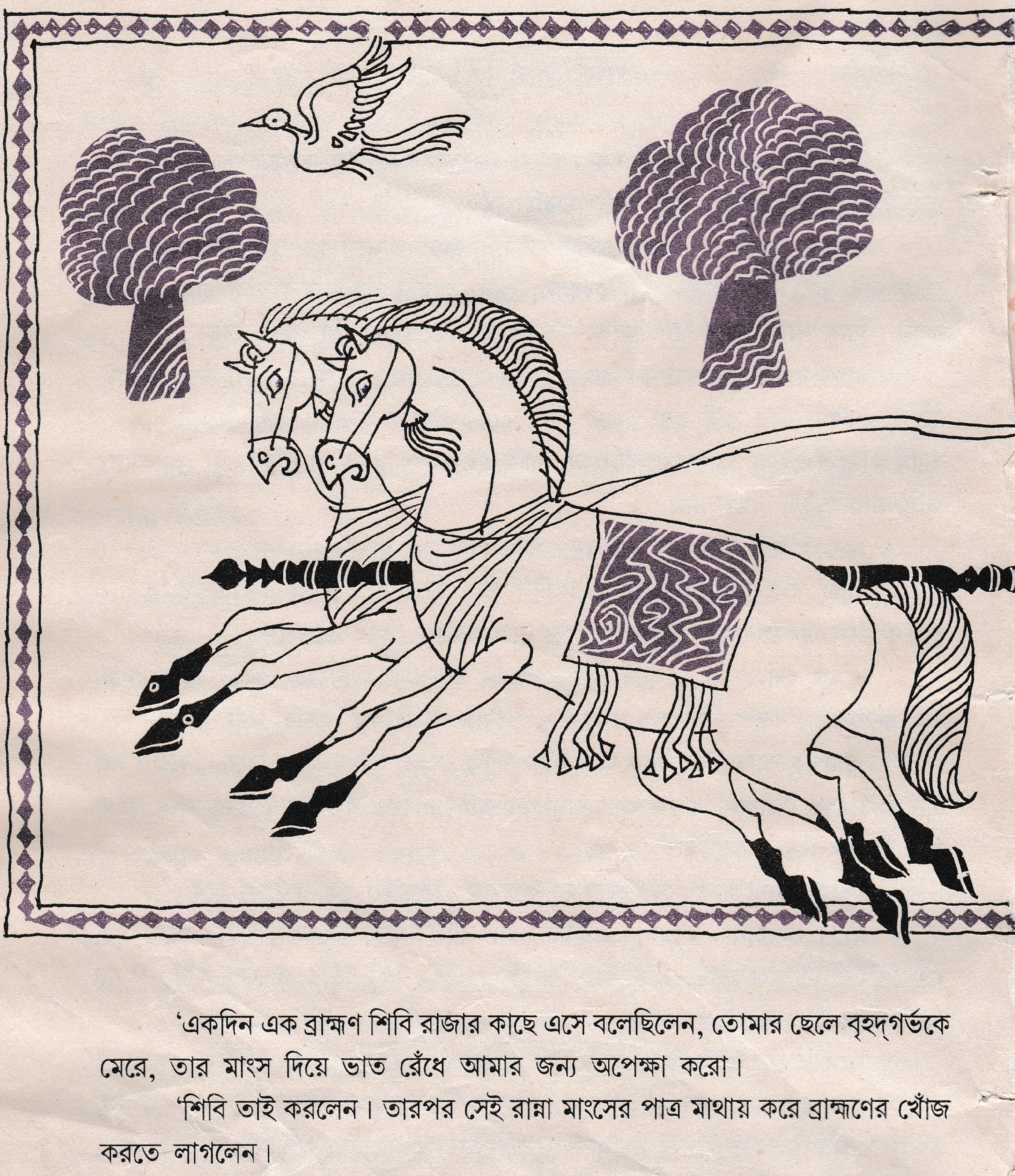
এবার নারদকে একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তারপর কে স্বর্গচ্যুত হবে?'

নারদ বললেন, 'বসুমনা। একদিন তাঁর বাড়ি গিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করে বলি, তোমার পুষ্পক রথ লাভ হোক। পুষ্পক রথ পেলে, আমি তাঁর প্রশংসা করি। তখন তিনি বলেন, এ রথ আপনারই।

'আবার তাঁর কাছে গিয়ে রথের প্রশংসা করলাম। তিনি আবার ওই কথা বললেন। ওই সময় আমার রথের দরকার ছিল না। কিন্তু তৃতীয়বার যখন গিয়ে ওই কথা বললাম, তখন দরকার ছিল। তবু তিনি রথ না দিয়ে বলেছিলেন, আপনার আশীর্বাদ সত্যি হয়েছে। ওই কপট কথার জন্য তাঁর পতন হবে।'

এবার নারদকে শেষ প্রশ্ন করা হল, 'তারপর কার পতন হবে? শিবি রাজার?'

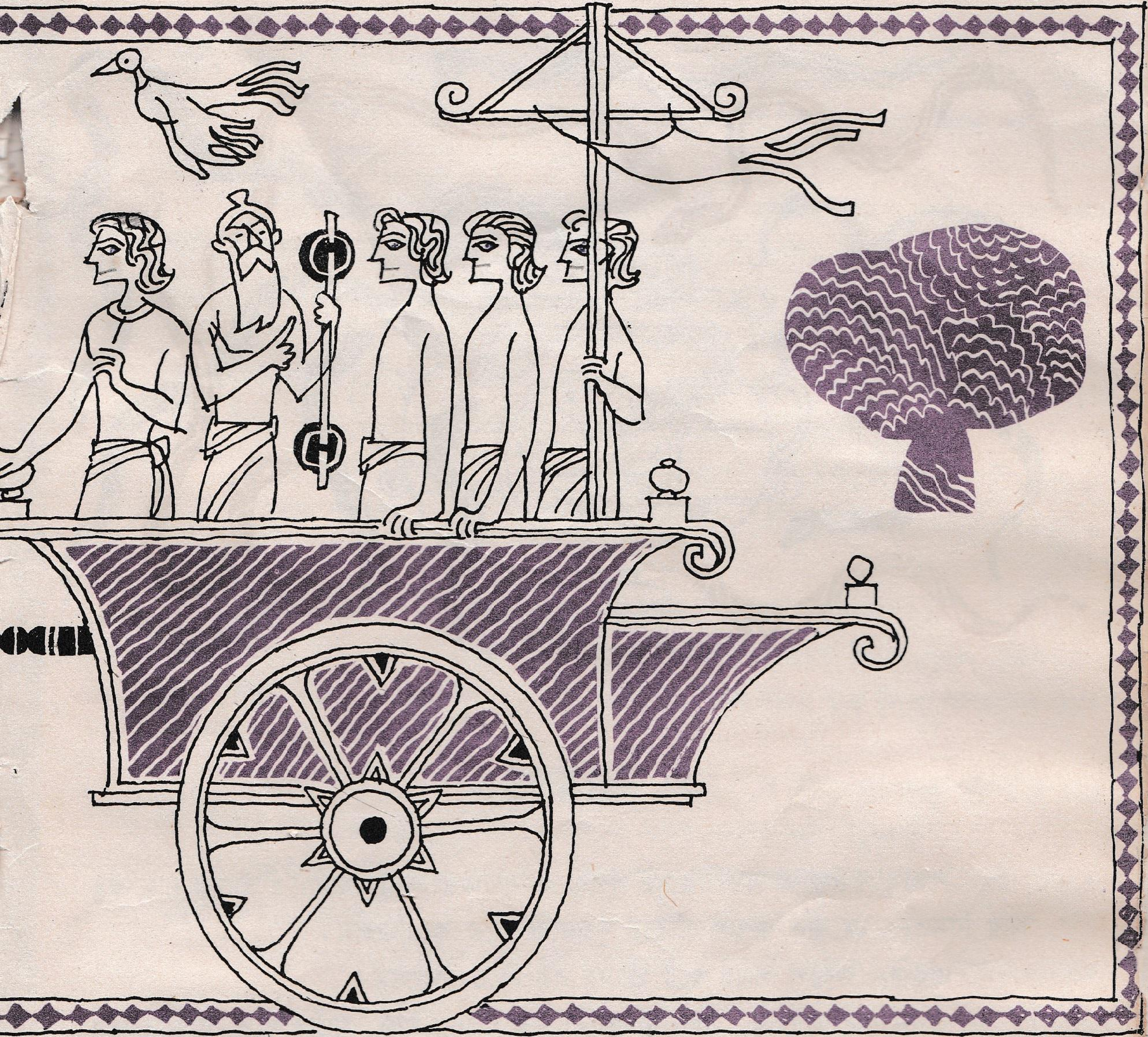
নারদ বললেন, 'আমারই হবে। আমি তাঁর সমান নই।



'একদিন এক ব্রাহ্মণ শিবি রাজার কাছে এসে বলেছিলেন, তোমার ছেলে বৃহদ্‌গর্ভকে মেরে, তার মাংস দিয়ে ভাত রেঁধে আমার জন্য অপেক্ষা করো।

'শিবি তাই করলেন। তারপর সেই রান্না মাংসের পাত্র মাথায় করে ব্রাহ্মণের খোঁজ করতে লাগলেন।

'একজন লোক এসে তাঁকে বলল, ওদিকে বামুনতো রেগেমেগে আপনার ধনরত্ন রাখার ঘর, অস্ত্র রাখার ঘর, অন্তঃপুর, হাতিশালা, ঘোড়াশালা, সব যে পুড়িয়ে ছাই করল!



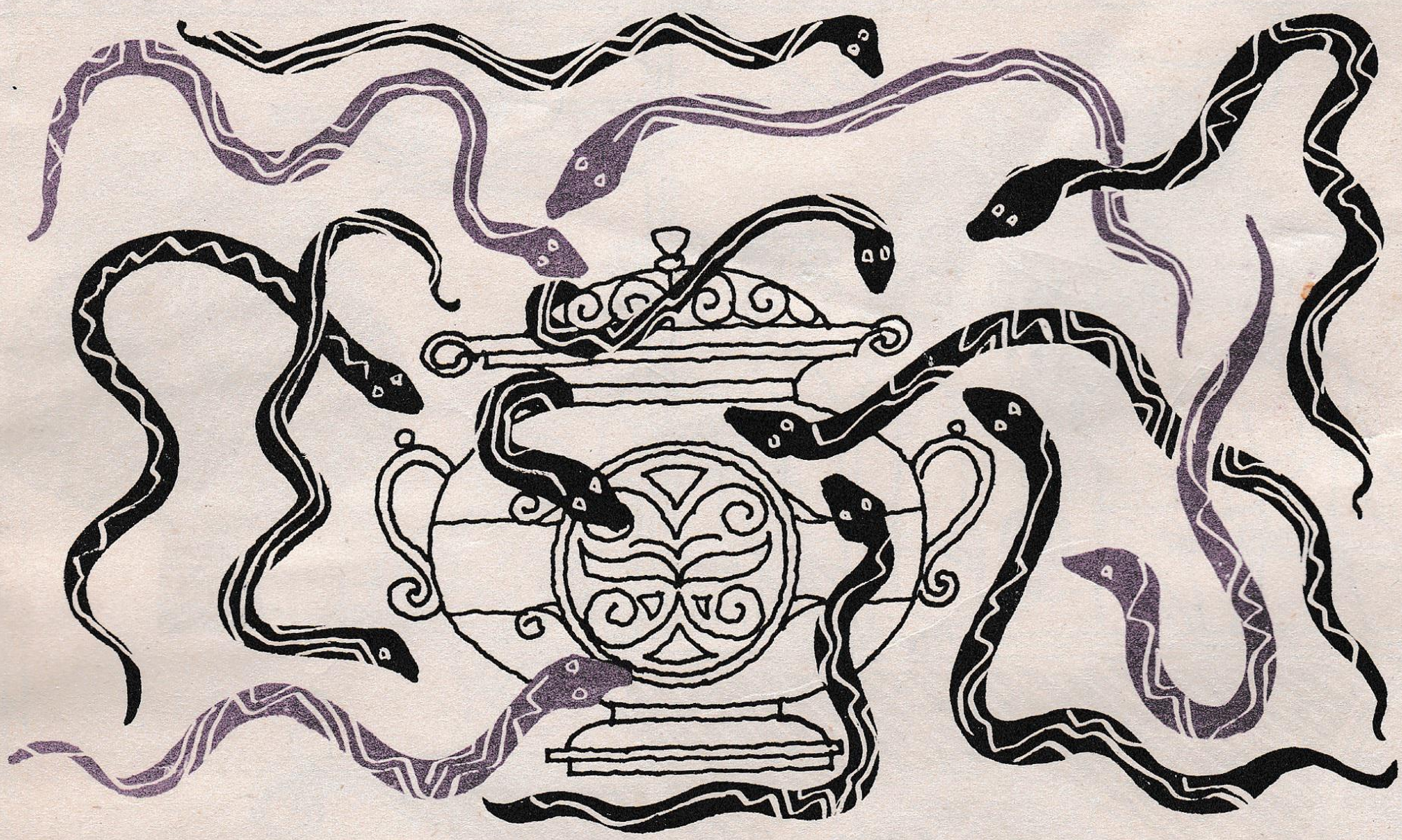
'শিবি তেমনই শান্তভাবে ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে বললেন, আপনার খাবার তৈরি। খেতে বসুন।'

'ব্রাহ্মণ আশ্চর্য হয়ে, মাথা নিচু করে রইলেন।

'শিবি আবার বলাতে বললেন, তুমিই খাও।

'শিবি সে কথাও পালন করতে যাচ্ছেন দেখে, ব্রাহ্মণ তাঁর হাত ধরে বললেন, তুমি ক্রোধ অভিমান জয় করেছ। ব্রাহ্মণের জন্য সব ত্যাগ করতে পার। তুমি ধন্য।

'শিবি চেয়ে দেখলেন দেবতাদের মতো পুণ্য গন্ধযুক্ত অলংকার পরে তাঁর ছেলে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ব্রাহ্মণও অদৃশ্য হলেন। তিনি স্বয়ং বিধাতা।'



সমুদ্রমন্থন

সত্যযুগে দক্ষ প্রজাপতির দুই সুন্দরী ও সুলক্ষণা কন্যা ছিলেন। তাঁদের নাম কদ্রু আর বিনতা। মহামুনি কশ্যপ তাঁদের দুজনকে বিয়ে করেছিলেন।

একদিন কশ্যপ প্রসন্ন হয়ে তাঁদের বর দিতে চাইলেন।

তখন কদ্রু বললেন, 'সমান বলশালী এক হাজার নাগ, অর্থাৎ সাপ, আমার পুত্র হোক।

বিনতা বললেন, 'আমাকে মাত্র দুই পুত্র দিন। কিন্তু তারা যেন কদ্রুর ছেলেদের চেয়েও বলবান আর তেজস্বী হয়।'

কশ্যপ বললেন 'তথাস্তু।'

যথা সময়ে কদ্রু এক হাজার আর বিনতা মাত্র দুটি ডিম্ব প্রসব করলেন। আর পাঁচশো বছর পরে, কদ্রুর ডিমগুলি থেকে এক হাজার পুত্র জন্মাল। বিনতার ডিম দুটি ফুটল না। তখন ধৈর্য হারিয়ে বিনতা একটি ডিম ভেঙে দেখে তাতে একটি শিশুর দেহের উপরের অর্ধেকটা আছে, নিচেরটা অপরিণত। সে জন্মেই রেগে মাকে বলল, 'এর জন্য

তুমি পাঁচশো বছর কদ্রুর দাসীগিরি করবে। অন্য ডিমটি ভেঙো না। তার মধ্যে তোমার ছেলে জন্মে তোমার দাসীগিরি মোচন করবে।' এই বলে আকাশে উড়ে গিয়ে অরুণ রূপে সূর্যের সারথী হলেন।

যথা সময়ে, অন্য ডিম থেকে পক্ষীরূপী গরুড় জন্ম নিয়েই মাকে ছেড়ে আগুনের হলকার মতো উজ্জ্বল ও বিশাল দেহ নিয়ে আকাশে উড়ে গর্জন করতে লাগলেন। তারপর সমুদ্রের অন্য পারে মায়ের কাছে উড়ে গেলেন।

সেখানে গিয়ে দেখেন তার দুঃখিনী মা বিনতা, তাঁর সতীন কদ্রুর দাসীগিরি করছে। কদ্রুর একশো সাপ-ছেলে হুকুম দিল — গরুড় যদি নিজের শক্তি বলে তাদের জন্য অমৃত এনে দিতে পারে, তা হলে নিজের মা এবং গরুড় দুজনেই মুক্তি পাবে।

গরুড় সর্বদা খাই খাই করেন। যাবার আগে মাকে বললেন, 'পথে কী খাব ?'

বিনতা বললেন, ' সমুদ্রের ধারে নিষ্ঠুর নিষাদরা থাকে। তাদের খেয়ো। খবরদার, ব্রাহ্মণদের অনিষ্ট কোরো না।'

মায়ের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে গরুড় অমৃত আনতে চললেন।

মাঝ পথে একবার ভুলে একজন ব্রাহ্মণ আর তাঁর স্ত্রীকে গিলে ফেলে জ্বালা বোধ করায় সঙ্গে সঙ্গে বের করে দিয়ে তাঁদের আশীর্বাদ নিয়ে গরুড় তাঁর পিতা কশ্যপের কাছে গিয়ে বললেন, 'পথে কী খাব ?'

কশ্যপ বললেন, 'বৎস, ওই সরোবর দেখছ, ওর তীরে শাপগ্রস্ত দুই ভাই গজ ও কচ্ছপ রূপে নিজেরা মারামারি করছে। ওদের খেলে সৃষ্টি জুড়োবে।'

অনুমতি পাওয়ামাত্র এক নখে গজ ও এক নখে কচ্ছপকে তুলে, উড়তে উড়তে গরুড় দেখতে লাগলেন কোথায় বসে এদের নিশ্চিন্তে ভোজন করা যায়।

পাছে তাদের ডালে বসেন তাই গাছপালারা ভয়েই অস্থির। এক বিশাল বটবৃক্ষ বলল 'আমার ডালে বসে খাও।' কিন্তু একে নিজের বিশাল দেহ, তার উপর গজ-কচ্ছপের ওজন নিয়ে বসামাত্র মড়মড় করে ডাল ভেঙে পড়ল। তার তলার দিকে মুনিরা মাথা নিচের দিকে করে ঝুলছেন দেখে, ভয় পেয়ে গরুড় শাখাটি ঠোঁটে ধরে দেশ দেশান্তরে ঘুরতে ঘুরতে গন্ধমাদন পর্বতে পৌঁছলেন।

সুখের বিষয় কশ্যপ সেখানে তপস্যা করছিলেন। তিনি পুত্রের সাহায্যে বালখিল্যদের বললেন, 'গরুড় লোকের মঙ্গলের জন্য ওষুধ নিয়ে যেতে চায়, আপনারা দয়া করে নেমে পড়ুন। মুনিরা তৎক্ষণাৎ গরুড়কে শত শত আশীর্বাদ করে হিমালয়ে চলে গেলেন।

গরুড় শাখাটি মুখে নিয়েই পিতাকে বললেন, 'মানুষ নেই এমন জায়গা বলুন যেখানে এই ডালটি নামাতে পারি।'



কশ্যপ হিমালয়ের এক নির্জন পর্বতের কথা বললেন। সেখানে নেমে ডাল নামিয়ে রেখে, গরুড় নিশ্চিন্তে গজ-কচ্ছপ ভোজন করলেন। তারপর আবার উড়ে চললেন।

এদিকে স্বর্গে ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতারা মহা ভীত হলেন। গরুড় অমৃত হরণ করতে আসছে। এর কী উপায় হবে? তাঁরা অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে, তাঁকে বাধা দেবার জন্য তৈরি হতে লাগলেন।

অমৃতের রক্ষক বিশ্বকর্মা গরুড়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ লড়াই করে, মাটিতে পড়ে গেলেন। গরুড়ের ডানার ঝাপটায় ধুলো উড়ে দেবলোক অন্ধকার হল। সে যুদ্ধে গরুড় জয়ী হলেন।

তিনি নিজের শরীর কুঞ্চিত করে, সোনার বরণ ক্ষুদ্র দেহ ধরে অমৃত রক্ষাগারে ঢুকলেন। দেখলেন অমৃতের কুম্ভের চারদিকে একটা ধারালো লোহার চক্র ঘুরছে। চাকার নিচে দুটি বিষধর সাপ।

গরুড় তাদের বধ করে, অমৃত পান করবার চেষ্টা না করেই অমৃতের কুম্ভ নিয়ে বাইরের আকাশে বেরিয়ে এলেন। প্রসন্ন হয়ে বিষ্ণু বললেন, 'বর চাও।'

গরুড় বললেন, 'আমি তোমার উপরে থাকতে আর অমৃত পান না করেই অমর হতে চাই।'

বিষ্ণু বললেন, 'তথাস্তু।'

গরুড় বললেন, 'তুমিও আমার কাছে বর চাও।'

বিষ্ণু বললেন, 'তুমি আমার বাহন হও। আমার রথের উপরে থেকো।'

গরুড় বললেন, 'তথাস্তু।' এই বলে মহা বেগে আকাশে উড়ে চললেন।

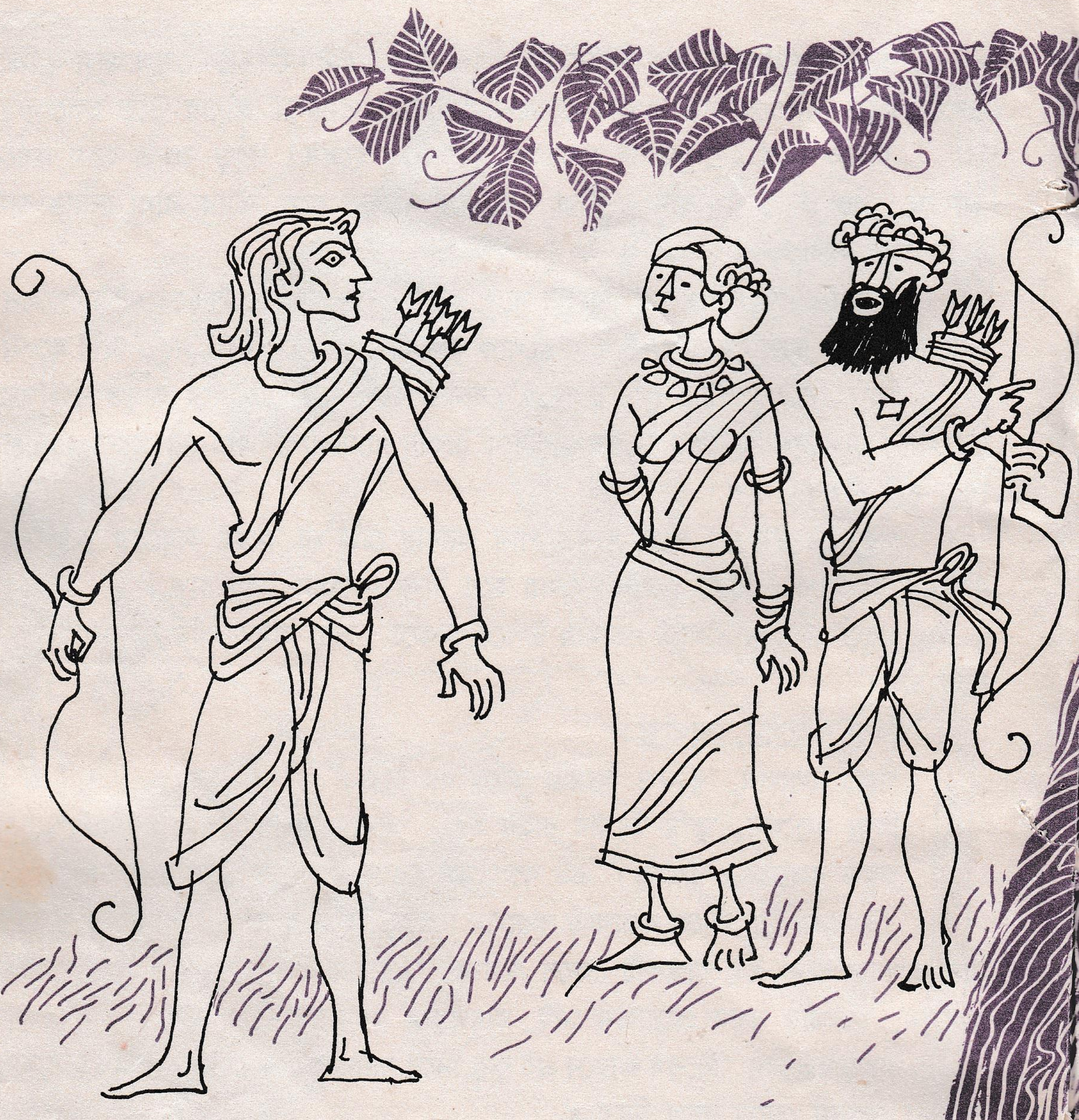
এই সময় ইন্দ্র তাঁকে বজ্রাঘাত করলেন। গরুড় হেসে বললেন 'তোমাদের সকলের মান রাখবার জন্য এই পালকটি ফেলে দিলাম। 'এর পর ইন্দ্র তাঁর সঙ্গে সখ্য পাতিয়ে বললেন, 'তোমার যখন প্রয়োজন নেই, অমৃতকুম্ভ আমাদের দিয়ে যাও।'

গরুড় বললেন, 'বিশেষ কারণে এই কুম্ভ নিয়ে যাচ্ছি। একে যেখানে মাটিতে নামাব, তোমরা সেখান থেকে তুলে নিয়ো।'

এই বলে কদ্রুর কাছে গিয়ে বললেন, 'অমৃত এনে কুশের উপর রাখছি। তোমরা স্নান করে এসে, পান করো। তার আগে আমার মাকে মুক্তি দাও।' এই বলে মাকে নিয়ে প্রস্থান করলেন।

সাপের দল স্নান করে ফিরে এসে, অমৃতের ঘড়ার উপর হামলে পড়ল। মাঝখান থেকে ইন্দ্র অমৃত হরণ করলেন।

সাপরা হায় হায় করে কুশ চাটতে লাগল এবং কুশের ধার লেগে তাদের জিব চিরে গেল।



কিরাত এবং অর্জুনের কথা

কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের আরম্ভে একদিন যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন, 'ভাই, তোমার উপর আমরা নির্ভর করে আছি। আমি ব্যাসদেবের কাছে শেখা একটি মন্ত্র তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। তুমি উত্তর দেশে গিয়ে কঠোর তপস্যা করে, ইন্দ্রকে প্রসন্ন করে, তাঁর কাছ থেকে দিব্য অস্ত্র লাভ করে এসো।'



তারপর অর্জুন হিমালয় ও গন্ধমাদন পর্বত পেরিয়ে, ইন্দ্রকীল পাহাড়ে পৌঁছলেন। সেখানে কৃশকায়, জটাধারী এক তপস্বীকে গাছতলায় বসে থাকতে দেখলেন।

তপস্বী বললেন, 'বৎস, এই শান্তির স্থানে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসেছ কেন ? ধনুক ছাড়ো। তপস্যা করে তুমি পরমগতি পেয়েছ। কী চাও, বলো।'

অর্জুন হাত জোড় করে বললেন, 'ভগবান, আমাকে সব রকম অস্ত্র দিন। আর কিছু চাই না।'

ওই তপস্বী ছিলেন স্বয়ং ইন্দ্র। ইন্দ্র বললেন, 'বৎস, তুমি যখন শিবের দর্শন পাবে,

তখনই সব অস্ত্র তোমাকে দেব।' এই বলে অদৃশ্য হলেন।

অবশেষে অর্জুন এক ঘোর বনে পৌঁছে শাঁখের আর ঢাক-ঢোলের শব্দ শুনতে পেলেন।

বনের মহর্ষিরা মহাদেবকে সংবাদ দিলেন।

শিব কিরাতের বেশে ত্রিশূল হাতে দেখা দিলেন। সঙ্গে এলেন ওই রকম বেশে দুর্গা আর তাঁর সহচরীরা। আর ঠিক সেই সময়ে মূক নামের এক দানব বরাহ সেজে অর্জুনের দিকে তেড়ে এল।

অর্জুন ধনুক তুলতেই, কিরাতবেশী মহাদেব বললেন, 'থামো ! আমিই আগে ওর দিকে তাগ করেছি। ও আমার শিকার।'

অর্জুন তাঁর কথা না শুনে তির ছুঁড়লেন। দুই তির এক সঙ্গে বরাহের গায়ে বিঁধল। মূক দানব প্রাণত্যাগ করল।

অর্জুন হেসে কিরাতকে বললেন, 'বনের মধ্যে মেয়েদের এনেছ কেন ? শিকারের নিয়ম ভেঙে আমার বরাহকে মারলেই বা কেন ? এর জন্য তোমাকে মরতে হবে।'

এই বলে অর্জুন কিরাতের দেহে রাশি রাশি তির ছুঁড়তে লাগলেন। কিন্তু কিরাত অক্ষত দেহে দাঁড়িয়ে রইলেন।

অর্জুনের সব তির শেষ হয়ে গেল। অন্য যত অস্ত্র তাঁর ছিল, সব দিয়ে আঘাত করেও তিনি জয়লাভ করলেন না। তখন অস্ত্র ফেলে পাথর, গাছের ডালপালা যা পেলেন তাই দিয়ে বৃথাই আঘাত করলেন। শেষ পর্যন্ত মুষ্টিযুদ্ধ লাগল। কিরাত তাঁকে বিষম বাহুপাশে বুকে জাপটে ধরলেন। তখন যুদ্ধ ছেড়ে দিয়ে, মাটির শিব গড়ে অর্জুন তার গলায় ফুলের মালা পরানোমাত্র মালাটি কিরাতের মাথায় জড়িয়ে গেল।

এতক্ষণে অর্জুনের চোখ ফুটল। তিনি কিরাতের পা ধরে স্তব করতে লাগলেন।

মহাদেব প্রসন্ন হয়ে তাঁকে বর দিতে চাইলেন। অর্জুন বললেন 'আমাকে অস্ত্র দিন। আমি কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধকালে ওই অস্ত্র প্রয়োগ করব।'

শিব তখনই তাঁকে সেই অস্ত্র দিয়ে, তার প্রয়োগের নিয়ম শিখিয়ে দিলেন।

শিবের স্পর্শে অর্জুনের দেহের সব ব্যথা দূর হয়ে গেল। শিব দুর্গাও অন্তর্হিত হলেন।

তারপর অন্যান্য দেবতারাও দর্শন দিয়ে, অর্জুনকে নানা অস্ত্রে বলীয়ান করলেন।

ইন্দ্র বললেন, 'তোমাকে একবার দেবলোকে যেতে হবে। সেখানেই দিব্য অস্ত্রগুলি তোমাকে দান করা হবে। তোমার জন্য রথ আসবে।'

এই বলে দেবতারা প্রসন্নচিত্তে প্রস্থান করলেন।



ইল্বল আর বাতাপির গল্প

বনবাসের সময় নানা তীর্থে ঘুরতে ঘুরতে পাণ্ডবরা মণিমতী পুরীতে পৌঁছলেন। তাঁদের সঙ্গে লোমশ মুনি ছিলেন। তিনি এক আশ্চর্য গল্প বললেন।

সেকালে ওইখানে ইল্বল আর বাতাপি নামে দুই দৈত্য বাস করত। তারা ছিল দুই ভাই।

একদিন ইল্বল একজন ব্রাহ্মণ সাধুকে বলল, 'আমাকে ইন্দ্রের মতো সুন্দর একটি পুত্র দিন।' ব্রাহ্মণ তাতে রাজি না হওয়াতে ইল্বল রেগেমেগে প্রতিশোধ নেবার ব্যবস্থা করল।

সে জাদুবলে বাতাপিকে পাঁঠা বানিয়ে, তাকে কেটেকুটে দিব্যি সুস্বাদু করে রেঁধে বেড়ে, ব্রাহ্মণ ভোজন করাত। তাদের খাওয়াদাওয়া হলে, ইল্বল চেঁচিয়ে ডাকত 'বাতাপি! বাতাপি!' আর বাতাপি হতভাগ্য ব্রাহ্মণদের পেট ফুঁড়ে বেরিয়ে আসত। এই ভাবে কত ব্রাহ্মণ যে প্রাণ হারালেন তার গোণাগুন্তি নেই।

এই সময়ে একদিন অগস্ত্যমুনি পথে যেতে যেতে দেখেন একটা গুহার ভিতরে তাঁর পিতৃপুরুষরা মাথা নিচু করে ঝুলে আছেন। তাঁরা দুঃখ করতে লাগলেন অগস্ত্যের একটিও ছেলে নেই যে তাঁদের সদ্‌গতি করে!

এ কথা শুনে অগস্ত্য কথা দিলেন যে তিনি তাঁদের ব্যবস্থা করবেন।

তা হলে তাঁকে সংসারী হতে হয়। তাই হলেন তিনি। বিদর্ভরাজের কন্যা লোপামুদ্রার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হল।

এ মেয়ে তাঁরই যোগ্যা বটে। বিয়ের পর অগস্ত্য তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'তোমার ওই দামি দামি সাজ-পোশাক ছেড়ে দিয়ে, আমাদের মতো সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করতে পারবে তো?'

লোপামুদ্রা প্রসন্ন মনে তাই করলেন। কিছুদিন বাদে অগস্ত্য তিনজন সঙ্গী নিয়ে ইল্বলের বাড়িতে গেলেন। ততদিনে নানান মন্দ উপায়ে ইল্বল মহা ধনী হয়ে উঠেছিল।

সে তো মহা খুশি হয়ে অতিথিদের আদর করে বসাল। তারপর অতিথিদের সামনেই বাতাপি পাঁঠা হয়ে গেল। ইল্বল তাকে কেটেকুটে রেঁধে-বেড়ে, অতিথিদের সামনে পরিবেশন করল।

সঙ্গীরা বড়ই ভয় পাচ্ছিলেন, কিন্তু অগস্ত্য তাঁদের সাহস দিয়ে বললেন, 'আপনাদের কোনও ভয় নেই। এই মাংসটুকু আমি একাই খেতে পারব।'

এই বলে তিনি সত্যি সত্যি সবটাই খেয়ে নিলেন। তাঁর খাওয়া শেষ হলে, এক গাল হেসে ইল্বল ডাকতে লাগলেন 'বাতাপি! বাতাপি!'

দু চোখ কপালে তুলে অগস্ত্য বললেন 'আর ডেকে কী হবে? আমি তো তাকে হজম করে ফেলেছি!'

শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে, ইল্বল শান্তি স্থাপন করলেন।